মেঘলা দুপুর

মেঘলা দুপুর

প্রতিভা বসু



এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স । কলিকাতা বারো।

প্রকাশক। নির্মলেন্দু ভদ্র
এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স। এ-৯, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

দুই টাকা চার আনা

প্রচ্ছদ-শিল্পী। পূর্ণেন্দু পত্রী
প্রচ্ছদ-ব্লক ও মুদ্রণ। ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও

মুদ্রাকর। সুরেন্দ্রনাথ পান
নিউ সরস্বতী প্রেস। ১৭, ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

মেঘলা দুপুর

সাহিত্যিকের বিয়ে

আলো জ্বললো, বাঁশি বাজলো—মালাচন্দন প'রে বাংলাদেশের বিখ্যাত লেখক নিশীথ রায়—বিয়ে শেষ ক'রে বাইরে এলো সিগারেট খেতে। বিয়ে-বাড়ি, অসম্ভব গোলমাল চলেছে—তারই মধ্যে একটু অপেক্ষাকৃত নির্জনতার সন্ধান করতে-করতে নিশীথ বাথরুমের পিছন দিককার ছোটো খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। অন্ধকার রাত—আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার বুকের মধ্যে যেন কেমন ক'রে উঠলো, কি যেন মনে প'ড়ে অত বড়ো লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ শরীর যেন নিমেষে নিস্তেজ হ'য়ে এলো। অর্ধদগ্ধ সিগারেটটি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

কে জানে উচিত হ'লো কিনা। বিবাহের মতো একটি চরম নিষ্পত্তিতে যাওয়ার আগে আরো একটু ভাবা উচিত ছিলো। এ-কথা এই প্রথম মনে হ'লো নিশীথের। বিয়ের আগের মুহূর্তেও যদি এ কথা তার মনের উপর কোনো ছায়া ফেলতো—হয়তো উঠে যেতো সে সেখান থেকে—কেলেঙ্কারি হ'তো কিন্তু তার তো দায়িত্ব থাকতো না। মিলি কি দুঃখিত হতো? কিন্তু দুঃখ তো সে আরো কাউকে দিয়েছে? যার দুঃখের কাছে মিলির দুঃখটা হ'তো নিতান্তই প্রথম পাঠ। হটাৎ মিলির চন্দনচর্চিত, লাল টুকটুকে শাড়ি-ঘেরা সুন্দর মুখখানা মনে ক'রে একটু শান্তি পাবার চেষ্টা করলো সে। মিলি সুন্দরী—আরঐ সুন্দর মুখই তাকে অভিভূত করেছিলো। ঐ মুখের উপর তার কোনোদিন সম্পূর্ণ অধিকার আসবে এ-কথা কি বিয়ে না-করলে ভাবা যেতো?

ঘরে এসে দেখলো মিলিকে নিয়ে আত্মীয়রা আসর জমিয়েছে, তাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলো, 'এই যে—আসুন, আসুন। এই মণি, যা ওদের খাবার নিয়ে আয়।' যথাসম্ভব হাসিমুখ ক'রে নিশীথ এসে বসলো।

ঐ তার স্বভাব। যতক্ষণ কিছু তার হাতের নাগালের বাইরে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য সে অশান্তিতে ম'রে যায় কিন্তু হাতের মুঠোয় এলেই আসে বিরক্তি। তার এই খামখেয়াল তাকে অনেক দুঃখ দেয়, কিন্তু তবু তো এ নেশা তাকে ছাড়ে না। মিলিকে বিয়ে করবার জন্য সে পাগল হ'য়ে গিয়েছিলো, কিন্তু যে মুহূর্তে বিয়ে ঠিক হ'লো তার উৎসাহ গেলো ভেঙে, বিয়ে করতে ব'সে মনে হ'লো—এই? এর জন্যেই এত ব্যাকুল হয়েছিলাম আমি? এতই যা সহজলভ্য তা দিয়ে আমার হবে কী? মনে-মনে অনুভব করলো, এতদিনকার ইচ্ছাটা ছিলো তার জেদের জন্য, ভালোবাসার জন্য নয়।

অনেক রাত্রে ঘর নির্জন হ'লো। মিলি বললো, 'তুমি শোও, আমি শাড়িটা ছেড়ে আসি।' নিশীথ আলো নিবিয়ে শুলো—সচিত্র কুলোর উপর জ্বলতে লাগলো মঙ্গল-প্রদীপ—ছোট্ট শিখার আবছা-আবছা আলোয় আবার নিশীথের বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠলো।

একটু হয়তো তন্দ্রা এসেছিলো—তীব্র বৈদ্যুতিক আলোটি জ্ব'লে উঠতেই চোখ কুঁচকে গেলো—হাত চাপা দিয়ে ঈষৎ জড়িত গলায় বললো, 'এত দেরি হ'লো তোমার? এসো, আলোটা নিবিয়ে দাও—'

'এই যে—'টিপ ক'রে আলো নেবাবার শব্দ হ'ল। সঙ্গে-সঙ্গে

নিশীথ মিলির গায়ের উষ্ণতা অনুভব ক'রে একটু সচেতন হ'য়ে মুখ ফেরালো। মিলি বললে, 'ঘুম পেয়েছে? এখুনি?'

'একটা বিয়ে করার ক্লান্তি কি কম?' নিশীথ একখানা হাত বাড়িয়ে দিলো মিলির দিকে।

মিলি ঐ বাহুবন্ধনে সহজে ধরা দিলো না—ঈষৎ অভিমানভরা গলায় বললো, 'সবাই বলছে তুমি নাকি ভীষণ গম্ভীর হ'য়ে আছো? কেন বলো তো? বিয়ে ক'রে আপশোষ হচ্ছে না তো?'

'আপশোষ? পাগল নাকি?'—নিশীথ সজোরে আকর্ষণ করলো মিলিকে—সকল বাধা অতিক্রম ক'রে সেই মুখ—যে-মুখের শোভা তাকে সকল বিবেক থেকে চ্যুত করেছে—তার উপর চেপে ধরলো নিজের ঠোঁট। 'কী যে করো! উঃ, অত জোরে কেউ চুমু খায়!' মিলি ঈষৎ উত্তেজিতভাবে উঠে বসলো। তার চুল খুলে গেছে, দু'হাতে চুল পরিপাটি করবার চেষ্টা করলো। আধো অন্ধকারে তাকে যেন কেমন অদ্ভুত দেখালো। কাজল লেপটে মুখময় হয়েছে, ঠোঁটের লাল রঙ ছড়িয়ে গেছে চারিদিকে—মুখখানা যেন অন্য কারো। তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিশীথ হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে বালিশে গুঁজলো। মিলি শুয়ে প'ড়ে বললো, 'ঘুমুলে?' সে সাড়া দিলো না।

খুব ভোরে—যখন কাকপক্ষীও ডাকেনি—আস্তে আস্তে নিশীথ বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। মিলির মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। কুলোর প্রদীপ সারা রাত জ্ব'লে-জ্ব'লে নিবে গেছে—অন্ধকারে দরজা খুলতে তাকে একটু হাতড়াতে হ'লো। নিঃশব্দে চোরের মত টিপিটিপি পায়ে সে বেরিয়ে এলো বড়ো রাস্তায়। তারপর

একটু দাঁড়িয়ে থেকে সকালবেলাকার সর্বপ্রথম ট্রামটির শূন্য গহ্বরে নিজেকে নিক্ষেপ করলো।

যে-বাড়ির সামনে এসে সে দাঁড়ালো সে-বাড়ির অধিবাসীরা যে তখনো ঘুমন্ত তা তাদের বন্ধ দরজা আর নীরবতা থেকেই অনুমান করা যায়। একটুকু সময় দরজায় কান পেতে তারপর আস্তে ধাক্কা দিলো নিশীথ। মনে পড়লো একটি নির্দিষ্ট জানালার কথা— কম্পিত বুকে সে দাঁড়ালো গিয়ে সেই জানালার তলায়। জানালাটি হাঁ ক'রে খোলা। মৃদু রঙ-এর ভারি পর্দাটি কই? নিশীথ জানালা দিয়ে তাকালো ঘরের মধ্যে। ঘরটি শূন্য। মাথা তুলে দেয়ালের দিকের To Lateটি এবার লক্ষ্য করলে সে। দেয়ালের গায়ে ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো একটুক্ষণ—দুই চোখ তার আপনা থেকেই বুজে এলো। পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে তাড়াতাড়ি মুখ মুছে উপর দিকে তাকিয়ে বললো, 'বাড়িতে কে আছেন?'

ছোট্ট একটি মুখ রেলিংয়ের ফাঁকে দেখা গেলো।

'আপনি বাড়ি ভাড়া—ও মা নিশীথ-দা যে!' লাফাতে লাফাতে ছেলেটি নেমে এসে দরজা খুলে দিলো। হাত ধ'রে মুখ তুলে বললো, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'

'ছিলুম এখানেই, কিন্তু তোমাদের নিচের ভাড়াটেরা কই?'

'মালতীদিরা? ও মা, তারা তো কবে উঠে গেছে।'

'অনেকদিন? কদ্দিন বলতে পারো?'

অনেকক্ষণ চিন্তা ক'রে ছেলেটি বললো, 'বাধ হয় পনেরো-ষোলো দিন।'

'কোথায় গেছে জানো?

'না তো। জানেন নিশীথদা, মালতীদির অসুখ করেছিলো? কত কাঁদতো।'

'কাঁদতো?'—স্বপ্নের মতো উচ্চারণ করলো নিশীথ।

ছেলেটি নিশীথের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললো, 'আপনি আর আসেন না কেন?' নিশীথ জবাব দিলো না। একটু চুপ ক'রে থেকে নেমে এলো রাস্তায়।

মা আর মেয়ে। নিতান্তই দু'টি প্রাণীর সংসার। অত্যন্ত নিরুদ্বেগে আর নিরুত্তাপেই কাটছিলো দিন। এর মধ্যেই মালতীর এক মামাতো ভাই এলো পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে। মালতীর মা বললেন, 'সে কী রে, অত বড়ো বাড়ি, অত ঘর—তাতে তুই পড়া তৈরি করবার জায়গা পেলিনে, আর এলি এই পিসির কুঁড়েতে?'

'অসম্ভব, পিসিমা, অসম্ভব! শোনো তবে বাড়ির অবস্থা—মার ভাইঝি এসেছেন বর খুঁজতে—দিদির দেওর এসেছেন চাকরির সন্ধানে—আর দাদার শাশুড়ি এসেছেন কালীদর্শনের পুণ্যলাভ করতে। আমার যে দু'মাস পরে পরীক্ষা সে-বিষয়ে কি কারো খেয়াল আছে? যেই বাড়িতে আসুক না কেন, ঘরছাড়া হবে এই অভাগা। পরীক্ষা পর্যন্ত আমি বাপু তোমার ঐ অতিথিবৎসল ভ্রাতাটির বাড়ি আর যাচ্ছিনে।'

পিসিমা হেসে বললে, 'পাগলা।'

মালতী বললো, 'সেই ভালো ভাই, বেশ করেছো। ন'মাসে ছ'মাসেও তো একদিন তোমার টিকি দেখা যেতো না, এখন চমৎকার হোলো। আর তুমি থাকলে বাংলা উপন্যাসের শ্রাদ্ধ করা যাবে।

'কেন, তোকে তো এ-পাড়ার লাইব্রেরীর মেম্বর ক'রে দিয়েছি।'

'যা তোমার মড়াপোড়া লাইব্রেরী—যত রাজ্যের বটতলার আড্ডা ওখানে—ওদের বই ভদ্রলোকে পড়তে পারে!

'দাঁড়া, আজ তোকে একটা চমৎকার উপন্যাস কিনে এনে দেবো। আশ্চর্য বই! পড়লে আর ভুলতে পারবিনে। নিশীথ রায় তো বইটা লিখে বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ লেখকদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালো।'

উৎসাহে মালতী উদ্দীপ্ত হ'য়ে বললো, 'আজ কিন্তু আমাকেও নিয়ে বেরুতে হবে। বাবা, কদ্দিন যে চন্দ্রসূর্যের মুখ দেখিনি—'

বাধা দিয়ে মা বললেন, 'তোর আবার যাবার দরকার কী? ও যাবে দোকানে বই কিনতে—দেকানে মেয়েরা যায় নাকি?'

'যায় গো যায়। আজকাল মেয়েরা সব জায়গায় যায়। আমি আজ সিনেমা দেখতে যাবো—তরপর বই কিনে বাড়ি ফিবরো।'

'যা খুশি কর'—মা উঠে গেলেন।

আসলে বেরুনো মালতীর হয়ই না। এই মামাতো ভাইটি এলেই যা একটু এদিক-ওদিক করে। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে দুটো বাজতেই সাজগোজ ক'রে বেরুলো সে ভাইয়ের সঙ্গে সিনেমা দেখতে। বইয়ের দোকানে যেতে-যেতে তাদের প্রায় সন্ধ্যা হ'য়ে গেলো। রবি বললে, 'তুই আর দোকানে না গেলি—এখানে দাঁড়া, আমি আসছি।'

মালতী আপত্তি করলো, 'না ভাই, সন্ধ্যাবেলা এই ল্যাম্প-পোস্টটার তলায় আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না। ভারি বিচ্ছিরি কথা মনে পড়ে। কেন, দোকানে গেলে কী হয়?'

'পিসিমা—'

'হ্যাঁ, পিসিমা এখানে দেখতে আসবেন কিনা!' গেলো সে দোকানে। অপরিসর ছোট্ট ঘর। একজন যুবক নিতান্ত বিরস মুখে ব'সে-ব'সে বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছে। মালতী একটু সংকুচিত বোধ করলো। যুবকটি চোখ তুলেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো—চেয়ার ছেড়ে বললো, 'এখানে বসুন।' মালতী জড়োসড়ো হ'য়ে মুখ নীচু করলো—রবি বললো, 'না না, আপনি বসুন।'

'সে কেমন ক'রে হয়? আপনি বসুন'—চেয়ারটা মালতীর দিকে ঠেলে দিয়ে অস্ফুটে বললো, 'টাকার কুমির—অথচ দোকানের আসবাব কী! কাঠের না পারিস দুটো টিনের চেয়ারই রাখ না বাবা—আসুন আমরা এই বেঞ্চিটাই দখল করি।' যুবকটি লম্বা টুলটা একটানে দরজার কাছ থেকে টেনে ভিতরে নিয়ে এলো। রবি সসম্ভ্রমে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে গিয়ে একটু চুপ ক'রে থেকে বললো. 'কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি।'

'নিশ্চয়ই।'

'আপনার নাম—'

'আমার নাম নিশীথ রায়!'

'নিশীথ রায়! আপনিই সেই বিখ্যাত লেখক নিশীথ রায়?'

যুবকটি মাথা নেড়ে একটু হাসলো।

মালতী চমকে চোখ তুললো। একজন জলজ্যান্ত সাহিত্যিককে যে সে চোখের সামনে দেখছে এটা যেন সে বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারছে না। সে তো শুধু লেখাই পড়ে না, লেখককেও স্বপ্ন দেখে। তার মনের মধ্যে লেখক সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত কল্পনা আছে। যিনি

কথা নিয়ে এমন আশ্চর্য খেলা খেলেন, তিনি কি মানুষ ? তিনি যে দেবতা ! মালতী অবাক হ'য়ে সেই দেবতার দিকে তাকিয়ে রইলো। আর রবি আনন্দে আর শ্রদ্ধায় গ'লে গিয়ে কেবলি ঘাড় মুছতে লাগলো।

দোকানের কর্তা এলেন। কালো, পোড়া-পোড়া রংয়ের মুখ, মস্ত বটগাছের মতো দেহ। তাকে দেখেই নিশীথ রায় লাফ দিয়ে উঠলো, 'এত দেরি করলেন আপনি ? আমি প্রায় পনেরো মিনিট ধ'রে ব'সে আছি। দিন।'

'এই তো আপনার জন্য সব ঠিক রাখাই আছে, কিন্তু সবটা আজ—'

'না, না আজ ওসব চল্‌বে না—ভয়ানক দরকার আমার।'

রবির দিকে তাকিয়ে দোকানের কর্তা বললেন, 'কী বই চান ?'

'নিশীথ রায়ের নতুন যা-যা বেরিয়েছে সব বই কি আছে এখানে ?' রবির কথায় মালতী লাল হ'য়ে উঠলো—নিশীথ চকিতে একবার তাকালো তাদের দিকে।

'নিশ্চয়ই। একটু অপেক্ষা করুন। এই যে নিশীথবাবু—' টেবিলের দেরাজটা চাবি দিয়ে খুলে একতাড়া নোট নিশীথের হাতে দিয়ে একটু নিচু গলায় বললো, 'আর আপত্তি করবেন না।' নিশীথের লজ্জা করলো এর পরে কথা বলতে। নিঃশব্দে টাকাগুলো পকেটে ঢুকিয়ে বেরিয়ে গেলো। বেরিয়ে যেতেই ফিসফিস করে রবি বললো, 'দেখলি ?' তার চেয়ে নিচু গলায় মালতী বললো, 'ভাগ্যিস এসেছিলাম।'

পাঁচখানা নতুন বই কিনে তারা বেরিয়ে এলো। ট্রামের স্টপে এসে দেখলো নিশীথ রায়ও দাঁড়িয়ে আছেন একই উদ্দেশ্যে।

রবি আলাপ করবার লোভ সামলাতে পারলো না--কাছে এসে বললো, 'এ-রকম অপ্রত্যাশিতভাবে যে আপনাকে দেখবার সৌভাগ্য হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি।'

'আমার সঙ্গে দেখা হওয়া কি একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার?'

'অবশ্যই। এও যদি সৌভাগ্য না হয়'—মালতীর দিকে তাকিয়ে রবি বললো, 'ইনি আমার বোন মালতী মিত্র—আপনার একজন বিশেষ অনুরাগী।'

'সত্যি!' নিশীথ হাসিমুখে তাকালো মালতীর দিকে—মালতী চোখ নিচু করলো।

সবেগে একটি ট্রাম এগিয়ে আসছিলো। নিশীথ বললো, 'কোনদিকে? আমাকে তো উঠতে হচ্ছে।'

'আমরাও উঠবো।' রবি হাত বাড়িয়ে ট্রাম থামালো। ট্রামটি একেবারে ভর্তি—মালতীকে দেখে দু'জন উঠে দাঁড়িয়ে—লেডিজ সীটটি খালি ক'রে দিলো। কুণ্ঠিত হ'য়ে মালতী বললো, 'দু'জনের জায়গা একলা নিলুম, আপনি এখানে বসুন না।'

'না না—' নিশীথ একটা হাতল আঁকড়ে শরীরের টাল সামলালো। রবি বললো, 'সে হয় না—আপনি বসুন—'

'কী মুশকিল!'

'বসুন না—'

অগত্যা নিশীথ ব'সে পড়লো মালতীর পাশে, আর মালতী যথাসম্ভব জায়গা ছেড়ে দিয়ে স'রে গেলো জানলার দিকে।

একটু পরে নিশীথ বললো, 'ওগুলো কোন ভাগ্যবানের লেখা জানতে পারি কি?'

'আপনারই।'

'আমার! সব ক'টাই?'—বইগুলো মালতীর হাত থেকে নিয়ে ওলটাতে-ওলটাতে নিশীথ বললো, 'বাংলা দেশটা আপনার মতো পাঠকে ভ'রে গেলে আজ কি ভালোটাই না হ'তো বলুন তো? ট্রামের এই গুঁতোগুঁতির হাত থেকে রেহাই পেতুম অন্তত।'

'ঠাট্টা করছেন?'

'মোটেও না। যা সত্যি তা-ই বললুম। কিন্তু আপনি দেখছি ভারি কষ্ট ক'রে বসেছেন।'

'খুব ভালো বসেছি।'

'ওকে কি ভালো বলে?'

'কী বলে?'

'আমার যে এখানে বসাটা উচিত হয়নি সেটাই বলে—'

মালতী মৃদু হেসে বললো, 'আপনি যখন লেখক—তখন আপনাকে অন্তর্যামীই বলা চলে, কিন্তু এ-বিষয়ে আপনার হার হলো।'

'হার? কই, হার মানায় যে এত সুখ তা তো জানতুম না।' স্বভাব-সুলভ সরলতা থেকেই নিশীথ কথাটা বলেছিলো কিন্তু ব'লেই যেন একটু লজ্জিত বোধ করলো, আর মালতী জানলার দিকে মুখ ঘোরালো।

'আপনার বইগুলো—'

মালতী মুখ ফিরিয়ে একটু তাকিয়ে থেকে অত্যন্ত কুণ্ঠিত গলায় বললো, 'আপনার সঙ্গে কি কলম আছে?'

'কেন বলুন তো?'

'তাহ'লে ঐ বইয়ের কোনো-এক পাতায় যদি আপনি কিছু—'

'ও, অটোগ্রাফ? নিশ্চয়ই! তক্ষুনি নিশীথ বুক-পকেট থেকে কলম বার ক'রে নাম লিখলো। তারপর একটু থেমে তলায় লিখলো, 'সামান্য এই চেনা—রাখলো মনে অসামান্য দেনা।'

মালতী বললো, 'চেনাটা তো সামান্যের পর্যায়ে নাও থাকতে পারে।'

'তা যদি হয় তবে তো নিজেকে ভাগ্যবান ব'লেই গণ্য করবো। আর তা যদি নাও হয় তাহ'লে এটুকুর মূল্যও আমার কাছে কম নয়!'

'কী যে বলেন।' আনন্দে গ'লে গিয়ে মালতী বললো, 'আপনি যদি কখনো আমাদের কুঁড়েতে পা রাখেন!'

'সত্যিই বলছেন তো?'

'তা নয় তো কী!'

'শেষে কিন্তু সত্যিই একদিন গিয়ে হাজির হবো।'

ক্যাশমেমোর ও-পিঠে নিচু হ'য়ে নিজের ঠিকানা লিখতে-লিখতে মালতী হেসে বললো, 'আমার কি অতই ভাগ্য!'

বাড়ি এসে রবি বললো, 'বাব্‌বা, তোরা অত কী কথা বললি রে?'

'কেন, তোমার হিংসে হচ্ছিলো বুঝি?'

'হবে না? আমি দিলুম আলাপ করিয়ে, আর তোরা আমাকেই আর চিনলি না। আসলে নিশীথ রায় তোর প্রেমে প'ড়ে গেছে।'

'আহা রে—' মালতী রবিকে একটি প্রচণ্ড চিমটি কেটে কাপড় ছাড়তে চ'লে গেলো।

রাত্রিতে সেদিন ভালো ঘুম হ'লো না মালতীর।

তিন-চারদিন পরে কলেজে যাওয়ার মুখে রবি বললো, 'তোর নিশীথ রায়কে কাল দেখলাম রে।'

'আমার মানে?'

'তোর মানে তোর। অটোগ্রাফের নাম ক'রে অত প্রেমের কবিতা লিখলো, আর সে তোর হ'লো না?'

'ফাজিল!'

'সত্যি কথা বললাম কিনা।'

'থাক থাক, বেশি সত্যবাদী হ'য়ে কাজ নেই। শোনো, আজ কিন্তু বিকেলে আমি বেরুবো—কলেজ ক'রেই আড্ডা মারতে যেয়ো না।'

'ও, এ-ক'দিন বুঝি আশায় ছিলি, তাই আর বেরুবার নাম করিসনি।'

মালতী রাগ করলো—'না, তোমার সঙ্গে আর আমি কথা বলবো না!'

'তা তো বলবিই না—সব কথা সঞ্চয় ক'রে রাখ্—সাহিত্যিকগৃহিণী হ'লে ভবিষ্যতে কাজ দেবে।'

ঠাশ ক'রে পিঠের উপর এক চড় দিয়ে মালতি বললো, 'দাঁড়াও, আর যদি কোনো কাজ ক'রে দি তোমার।'

'উহুঁহুঁ লক্ষ্মীছাড়ি—' পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে রবি হাসিমুখে বেরিয়ে গেলো।

কথাটা মিথ্যা নয়। সত্যিই মালতী আশা করেছিলো নিশীথ একদিন আসবে। এ-ক'দিন সকাল থেকে থেকে-থেকে চমকে উঠেছে—দরজার মৃদুতম শব্দটিও তার কানকে ফাঁকি দিতে

পারেনি। অত্যন্ত আটপৌরে মানুষ সে—কিন্তু ক'দিন ধ'রে সে কি একটু বেশিরকম ফিটফাট থাকছিলো না? বাইরের ঘরটি কি একটু বেশিবার ঝাঁট দেয় নি? বইয়ের শেলফটা এর আগে সে কবে দু'বার ক'রে গুছিয়েছে?. মনে-মনে রবির কথাগুলো মেনে নিলো মালতী। পরিত্যক্ত ধুতিটি কোঁচাতে-কোঁচাতে সে অন্যমনস্ক হ'য়ে চ'লে গেলো ও-ঘরে। ঘরটি আজ আর গুছোতে ইচ্ছে করলো না।

বিকেলবেলা রবি বললো, 'কি রে, বেরুবি নাকি?'

'থাক গে।'

'ও, এখনো তাহ'লে আশা যায়নি!'

গম্ভীর মুখে মালতী বললো, 'কী যে ইয়ার্কি করো।'

'থাক, যাচ্ছি—' রবি বেরিয়ে গেলো।

মা বললেন, 'ব'সে রইলি কেন, চুলটুলগুলো বেঁধে নে—ময়লা কাপড়টা ছাড়।'

অনেকক্ষণ পরে আলস্য ভেঙে উঠে মালতী গেলো দরজাটা বন্ধ করতে।

'এই যে! ঈশ, কী খোঁজাটাই খুঁজেছি এতক্ষণ!'—রাস্তা থেকে নিশীথ মালতীকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে এলো বারান্দায়। মালতী বিস্ময়ে আনন্দে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো দরজা ধ'রে।

'চিনতে পারছেন না?'

'আসুন'—সচকিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি দরজার পাট দুটি খুলে ধরলো মালতী। তাড়াতাড়ি চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বললো, 'আমার এত ভাগ্য?'

'ভাগ্য নাকি? কই, আপনার ভাব দেখে তো আমি মোটেও ভরসা পাচ্ছিনে।'

'আমি ভাবতেও পারিনি—'

'বলা মাত্রই এ-রকম আসবো—না?'

'সত্যিই তো! আপনি যে আমার অনুরোধকে এতখানি সার্থক করলেন, আমি কি এতই যোগ্য?'—কৃতজ্ঞতায় মালতীর গলা যেন ছলছলে হয়ে উঠলো।

নিশীথ চেয়ারে বসেই পকেট থেকে একটি সিগারেট বার করলো—কিন্তু ধরাতে গিয়েই হঠাৎ থেমে বললো, 'খাবো?'

'নিশ্চয়ই।'—ঘরটি প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছিলো; মালতী গিয়ে আলো জ্বালিয়ে দিলো। আধ-ময়লা একখানি শাড়ি পরনে—অবিন্যস্ত খোলা চুল। আলো জ্বলতে মালতীকে স্পষ্ট দেখতে পেলো নিশীথ। তাকিয়ে থেকে অত্যন্ত সহজ গলায় বললো, 'বাঃ, কী সুন্দর চুল আপনার।'

মালতী অত্যন্ত লজ্জা বোধ করলো। ঈশ, কী অপরিষ্কার হয়েই না আজ আছে সে। ঘরখানার চারদিকে তাকিয়ে সত্যিই তার খারাপ লাগলো। তাড়াতাড়ি দুহাতে চুলের গোছা জড়াতে-জড়াতে বললো, 'একটু বসুন—আসছি।'

নিশীথ বললো, 'আপনি তো ভারি কৃপণ! অমনি বেঁধে ফেললেন! চুলগুলো কি আমি চোখে করে নিয়ে যেতাম?'

মৃদু হেসে মালতী ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

নিশীথ সেদিন একটু আন্দাজের অতিরিক্তই বসলো। যাবার সময় এগিয়ে দিতে গিয়ে মালতী বললো, 'আবার আসবেন।'

একটু থমকে দাঁড়ালো নিশীথ। হাসিমুখে বললো, 'নিশ্চয়ই

আসবো। রোজ এলে যদি অশোভন না হতো তাহ'লে তা-ই আসতাম।'

কিন্তু যতই অশোভন হোক না কেন এর পরে নিশীথ প্রায় মাঝে-মাঝেই আসতে লাগলো এ-বাড়িতে। তারপরে আরো ঘন-ঘন। শেষে রোজ রোজ।

রবি বললো, 'নাঃ, নিতান্তই একটা সাহিত্যিক ভগ্নীপতি কপালে আছে দেখছি।'

মালতী বললো, 'অসভ্য!'

'সত্যি কথা বললেই বুঝি অসভ্য?'

'সত্যি কথা হলো কেমন করে? তোমাদের কেবল খারাপ চিন্তা—স্ত্রী-পুরুষে বন্ধুত্ব হলেই প্রেম না?'

'আমি তো তা-ই জানি!'

'তবে তুমি ছাই জানো'—মালতী ঘর থেকে চলে গেলো।

এলেন মালতীর মা। মুখের ভাব গম্ভীর করে বললেন, 'তুই বেরুচ্ছিস নাকি?'

'কেন বলো তো?'

'এখুনি তো নিশীথ আসবে—আমি ভাবছিলাম কথাটা আমিই তুলি। ও যখন নিজে থেকে কিছু বলছেই না।'

'ছি, একজন ভদ্রলোক এলেই বুঝি তাকে বিয়ে করতে হবে! অত বড়ো একটা লোক—আসেন তাই কত ভাগ্যি। ও-সব কিছু বলতে যেয়ো না।'

রবি জামা গায়ে দিলো। মালতীর মা বিরক্ত হ'য়ে বললেন, 'তোদের যে কী ফ্যাশান তা আমি বুঝিনে।'

'না-বুঝেও যে মাঝে-মাঝে মাথা গলাও ঐ তো তোমার দোষ।'

'ওপরের গিন্নি কাল নানারকম জিজ্ঞেস করছিলেন। ছোটো ছেলেটা তো রাতদিন মালতীর পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী সব বলে গিয়ে কে জানে! ভালো লাগে না জবাবদিহি করতে।'

'কেন, জবাবদিহির কী আছে? কারো বাড়িতে কি কেউ বিয়ের মতলব ছাড়া আসতে পারে না? আর কার বাড়ি কে এলো, এ নিয়ে তারই বা অত মাথাব্যথা কেন?'

'কী জানি বাপু!' মালতীর মা চিন্তিতমুখে অন্য কাজে মন দিলেন। সন্ধের পরে নিশীথ এলো। দরজা খুলে দিয়ে মালতী বললো, 'এত দেরি?'

'মাঝে-মাঝে একটু আত্মসম্মানের চর্চা করি কিনা!'

'এখানে এলে বুঝি আত্মসম্মানে আঘাত লাগে?'

'লাগে না? তুমি তো জানোই—এই অভাগাকে তাড়ালেও সে যাবে না। তাই মাঝে-মাঝে তোমাকে দেখাই না-তাড়ালেও আমি যেতে জানি।'

'জানো নাকি?'

মালতী চুপ ক'রে রইলো। আরাম ক'রে ব'সে নিশীথ বললো, 'তোমার মা কোথায়?'

'আছেন।'

'আজ তাঁকে একটা কথা বলবো ভেবে এসেছি। তার আগে তোমার সঙ্গেও কিছু কথা হওয়া দরকার।'

মালতী একবার বিস্মিতচোখে তাকিয়েই বললো, 'ও।'

'ও মানে? কী কথা তা তুমি বুঝতে পেরেছো?'

'পেরেছি।'

নিশীথ সাগ্রহে বললো, 'তুমি কী বলো?'

একটু চুপ ক'রে থেকে মালতী বললো, 'ভালো করে ভেবে দেখেছো?'

'ভালো, ভালো, ভালো—এর মধ্যে যে এত কী ভাববার আছে তা তো জানিনে।'

নিশীথের মুখের উপর থেকে অবিন্যস্ত চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে মালতী বললো, 'সংসারের আর-পাঁচজন মানুষের থেকে যে তুমি একটু স্বতন্ত্র তা কি তুমি জানো? আমার তো মাঝে-মাঝে ভয় হয় তোমার জন্য। মনে হয় নিজের মন তুমি নিজেই বোঝো না।'

'পৃথিবীর যত বোঝা একা তুমিই বোঝো। কী করলে আমাকে তুমি বিশ্বাস করবে, বলতে পারো?'—অসম্ভব মুখ গোমরা করে নিশীথ সিগারেটে টান দিলো।

'রাগ হলো বুঝি?'

'আমার চেয়ে তো তুমিই আমার কথা বেশি জানো।'

'তা জানি—' হাসি মুখে মালতী বললো, 'একমাত্র মানুষ আমিই যে কিছুমাত্রও তোমার মনের কথা বুঝতে শিখেছে। আমি ছাড়া আর কে তোমাকে রক্ষা করবে সংসারের সকল বিপদ থেকে?'

'মালতী—'

'হ্যাঁ, আমিই রক্ষা করবো—একমাত্র আমিই জানি কী তুমি চাও।'

'তাহ'লে তুমি তো জান যে তোমার চাইতে এ-পৃথিবীতে বড়ো কামনা আর আমার কিছুই নেই।'

'সত্যি?'

'সত্যি না? সমস্ত দিন আমার কেমন করে কাটে তা কি তুমি জানো? লিখতে পারি না, পড়তে পারি না—কোনো কিছুতেই মন নেই। সমস্ত মনটা পড়ে আছে এখানে—সারাটা দিন কাটছে সন্ধ্যার প্রতীক্ষায়। তুমি কি চাও এ-ভাবে আমার মূল্যবান সময়গুলো অনর্থক হয়ে যায়?'

'পাগল, তোমার যা খুশি করবে—আমি চা করে নিয়ে আসি।' হয়তো নিজের উচ্ছলতাকে একটু সংযত করতেই মালতী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সেদিন ফিরতে নিশীথের একটু রাত্রি হলো। মালতীর মা না-খাইয়ে ছাড়লেন না। ফিরে এসে মনের মধ্যে সে এমন একটা চঞ্চলতা বোধ করলো যে কিছুতে ঘুমুতে পারলো না। ঘরময় অস্থির ভাবে পায়চারি করতে লাগলো। তারপর এক সময়ে টেবল-ল্যাম্প জ্বালিয়ে এতদিনকার অর্ধসমাপ্ত উপন্যাসখানা খুলে আবার লিখতে বসলো। আর দেরি নয়—টাকার জোগাড় তাকে করতেই হবে—তারপর আসবে মালতী—এই ঘর—এই চেয়ার, টেবিল—সমস্ত নতুন হয়ে উঠবে তার স্পর্শে। লিখতে লিখতে টেবিলে মাথা রেখেই সে চোখ বুজলো।

ঠিক এই রকম সময়েই মিলির সঙ্গে তার আলাপ হলো কোনো-এক চায়ের নিমন্ত্রণে।

উপন্যাস রচনায় ক'দিন তার একেবারে উদ্‌ভ্রান্তের মতো সময় কাটছিলো—সহসা এই আমন্ত্রণটি তাকে এ থেকে একটু বিচ্ছিন্ন করলো। কালো রংয়ের উপর উজ্জ্বল রুপোলি পাড়ের শাড়ি প'রে মেক-আপ করা অতিরিক্ত ফর্শা আর সুন্দর মুখ নিয়ে মিলি তাকে



অভ্যর্থনা করলো। খানিকক্ষণের জন্য নিশীথ বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। সামান্যই আলাপ হ'লো, কিন্তু বাড়ি ফিরে এসেও সেই মুখ সে ভুলতে পারলো না। মনের মধ্যে সেই মুখের প্রতি একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ তাকে টানতে লাগলো অবিরত।

পরের দিন গম্ভীরমুখে মালতী বললো, 'কাল আসোনি যে?' সে-কথার জবাব না দিয়ে নিশীথ বললো, 'আচ্ছা মালতী, আমি তো দেখতে এমন-কিছু ভালো নই—যদি পরম সুন্দর একটি ছেলে আজ এখানে আসে—নিশ্চয়ই তোমার মনে হবে যে আমার চেয়ে সে অনেক ভালো?'

তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে মালতী বললো, 'কাল কোথায় গিয়েছিলে?'

'একটা সভা ছিলো।'

'আশা করি অনেক সুন্দরী তরুণীরা সে-সভাকে উজ্জ্বল করেছিলেন।'

'সত্যি!—নিশীথ একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো, 'কী সুন্দর একটি মেয়ে দেখলাম। আশ্চর্য!'

'বুঝলাম।'

বিব্রত হয়ে নিশীথ বললো, 'কী বুঝলে?'

'না, কিছু না।' মালতীর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো।

'রাগ করলে নাকি?'

'রাগ করবো কেন?' মুখে হাসি টেনে মালতী মুখ ফেরালো। নিশীথ সস্নেহে তার হাতখানা নিজের মুঠোয় টেনে নিয়ে বললো, পাগল! সুন্দর জিনিষ দেখলে ভালো সকলেরই লাগে, তা

শুনে আবার রাগ করে নাকি ? বোকাটা।’—মালতী চুপ করে রইলো।

কয়েকদিন পরে রবি বললো, ‘নিশীথ রায় নাকি আজকাল খুব প্রজাপতি খাস্তগীরের বাড়ি যাচ্ছে রে ?’

‘প্রজাপতি খাস্তগীর ?’—অবাক হয়ে মালতী বললো, ‘সে আবার কে ?’

‘ও বাবা—সে হলো কলকাতার একটি বিখ্যাত মেয়ে। এ বি খাস্তগীরের কন্যা। নাম অবশ্যি মিলি—কিন্তু আমরা কলেজে তাকে প্রজাপতি খাস্তগীরই বলতুম।’

‘তোমাদের সঙ্গে পড়তো নাকি ?’

‘পড়েছিলো স্কটিশে এক বছর। যা সেজে আসতো !’

‘কী জানি, আমি তো জানিনে—’ মালতী মুখের ভাব খুব সহজ রাখবার চেষ্টা করলো।

রবি বললো, ‘নিশীথবাবু কিন্তু আজকাল সত্যিই আগের চেয়ে কম আসেন।’

‘উপন্যাস লিখছেন।’

‘লিখুন আপত্তি নেই—না করলেই হয়।’ জামা গায়ে দিতে দিতে রবি বেরিয়ে গেলো আর চিন্তাকুল হৃদয়ে মালতী জানালার শিক ধ’রে চুপ ক’রে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো। নিশীথের পরিবর্তনটা যে খুব অবহেলার যোগ্য নয় এ-কথা তার আগেও মনে হয়েছে, কিন্তু কথাটা যখন রবির মুখ দিয়ে বেরুলো—হঠাৎ যেন বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা লাগলো তার।

অনাথবন্ধু খাস্তগীর কলকাতার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। আর্থিক দিকটা তাঁর চোখে পড়বার মতোই। আর অর্থ থাকলে

সমাজে যে-ভাবে চলতে হয় সেই গতানুগতিকতা থেকেও তিনি চ্যুত নন। আটচল্লিশ বছর বয়সেও তাঁর স্ত্রী কুঞ্চিত মুখে রং মাখেন—ঘুরিয়ে শাড়ি পরেন। দুটি ছেলে বিলেতে পড়াশুনো করছে, ছোটোটি মিশনারি স্কুলে। একমাত্র কন্যা মিলি অবিশ্রান্ত ইংরিজি বলতে শিখেছে—বাঙালির মেয়ে হ'য়ে যতটা সম্ভব ফিরিঙ্গি কায়দাও তার নখদর্পণে। আছে বয়, বেয়ারা, সাজানো ড্রয়িং-রুম—সাহেব-সুবোর গতিবিধি—হঠাৎ এই বুড়ো বয়সে যে কেন সে-সব ছাড়িয়ে এক সাহিত্য-প্রীতি তাঁর মাথায় ঢুকলো কে জানে! স্ত্রী নাক শিঁটকোলেন, মিলি রুমাল মুখে চেপে ছোটো ক'রে হাসলো, কিন্তু অনাদি খাস্তগীর তাঁর সঙ্কল্পচ্যুত হলেন না। শোনা যায় যৌবনে তাঁর একটু-আধটু লেখার অভ্যাস ছিলো।

বলাই বাহুল্য, এ-ক্ষেত্রে নিশীথ রায়ের উপস্থিতি অনিবার্য। আসবার নিমন্ত্রণ পেয়ে নিশীথ রায় সুখীই হ'লো। বাপের চেয়ে কন্যার প্রতিই যে নিশীথের আকর্ষণটা বেশি থাকবে সে-কথা বলাই বাহুল্য। ভালো চা আর ভালো আনুষঙ্গিক—তার সঙ্গে খাস্তগীর-দুহিতার সাহচর্য যে-কোনো যুবকের পক্ষেই পরম লোভনীয়। মিঃ খাস্তগীর শনিবার-শনিবার একটা সাহিত্যিক বৈঠকের ব্যবস্থা করলেন—কিন্তু দু' এক সপ্তাহ পরেই নিশীথ নিয়মভঙ্গ ক'রে তার মাঝখানেও দু'একদিন আসতে লাগলো। কয়েকদিনের মধ্যে তার এটুকু অভিজ্ঞতা হ'লো যে মিলি তার নাগালের বাইরে। সে যে একজন দিগ্বিজয়ী সাহিত্যিক এটা কারো-কারো কাছে একটা মস্ত কথা হ'লেও মিলির কাছে তার কোনোই মূল্য নেই। মিলির লোভে এ-বাড়িতে যে-সব যুবকের সমাগম হয় তারা সকলেই কৃতী

পুরুষ কিন্তু পরমার্থে নয়, অর্থে। কথাপ্রসঙ্গে মিঃ খাস্তগীর একদিন বললেন, 'আপনি কী করেন?'

'লিখি।'

'লেখেন তো জানি, কিন্তু আমি বলছিলাম, কী করেন—লেখাটা তো আর কাজ নয়?'

'কা-জ নয়?'—নিশীথ বিস্মিত হ'য়ে তাকিয়ে রইলো খাস্তগীরের দিকে—বাড়ি এসেও নিশীথ মন থেকে কথাটা মুছে ফেলতে পারলো না। অনাথবন্ধু খাস্তগীরের লেখকদের ডেকে সভা করার মধ্যে কতখানি আন্তরিকতা ছিলো তা নিশীথ জানে না, কিন্তু আগ্রহটা ছিল পরিস্ফুট। লেখকরূপে লেখকের মর্যাদা দিতেও তিনি কার্পণ্য করেন না, কিন্তু বন্ধুরূপে, বিশেষ মেয়ের বন্ধুরূপে যেতে হ'লে তাকে যে শুধু লেখক থাকলেই চলবে না এ-কথাটাই এতদিনে অনুভব করলো নিশীথ। ভিতরে-ভিতরে তার আত্মসম্মান যেন গর্জন ক'রে উঠলো। ঐ তো সব পাণি-প্রার্থীর দল—নিশীথ রায়ের তারা হ'ল প্রতিদ্বন্দ্বী? নিশীথ রায় বাংলাদেশে একটাই জন্মায়, আর ওদের মত পতঙ্গ জন্মায় লক্ষ-লক্ষ। ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে সে যে খাস্তগীরের মেয়েকে অনায়াসে অর্জন করবার যোগ্য হ'তে পারে এটা দেখিয়ে দেবার একটা তীব্র বাসনা যেন তাকে দগ্ধ করতে লাগলো। আর ভাবা মাত্রই কাজ করা নিশীথের স্বভাব।

একদিন মালতী বললো, 'তোমাকে অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত দেখায় আজকাল। কেন বলো তো?

'উদ্‌ভ্রান্ত আছি তাই।'

'উপন্যাস শেষ হয়নি?'

'না।'

'অত ব্যাকুলতার কী আছে? ধীরে-আস্তে লিখলেই তো হয়। এখানে আসা তো প্রায় ছেড়েই দিয়েছো।

নিশীথ মালতীর মুখের উপর চোখ রাখলো। একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'একটা চাকরি নেবো ভাবছি।'

'চাকরি!'—মালতীর আদর্শে একটু ধাক্কা লাগলো। মনে তার যাই থাক—নিশীথের সঙ্গে সে খুব সহজভাবেই এতক্ষণ কথা বলবার চেষ্টা করছিলো। এবার একটু উষ্ণ হ'য়ে বললো, 'এটা কি খাস্তগীরদের আদেশে?'

'তার মানে?'

'তার মানে নিজের সম্মান নিজের হাতেই রাখতে হয়—সেখানে অন্যের পরামর্শ চলে না।'

'যদি তাই বলো তাহ'লে তো তোমার পরামর্শও সেখানে অচল।'

'আমার? আমি একজন অন্য হ'লাম?'—মালতীর গলার স্বর ঈষৎ কেঁপে উঠলো।

নিশীথ রায় লক্ষ্য করলো না, বললো, 'আমি সব সময়ে নিজের মতেই চলি, মালতী। আমি মনস্থির করেছি—একটা চাকরি নেবোই। আমি শুধু এটাই দেখিয়ে দেবো যে ইচ্ছে করলে নিশীথ রায় ধনীসমাজেও একজন কেউ-কেটা হ'য়ে বসতে পারে।'

নিজেকে সামলে নিয়ে মালতী বললো, 'ধনীর সঙ্গে প্রতি-যোগিতায় গৌরব নেই—গুণীর চেয়ে কেউ বড়ো না।'

'ও-সব মানুষের স্বপ্নের আদর্শ। মালতী, সংসারটা স্বপ্ন নয়, নিতান্তই সত্য।'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো মালতী। হঠাৎ এক সময়

বললো, 'কোনো-কোনো মানুষকে আমরা স্বপ্নচারী ভাবি ব'লেই আলাদা সম্মান দিয়ে থাকি। কিন্তু অত ক'রেও নিশীথ রায় মিলি খাস্তগীরের যোগ্য হ'তে পারবেন কিনা সে-বিষয়ে আমার যথেষ্টই সন্দেহ আছে।'

'তুমি কি আমাকে—' রবি ঘরে এলো, নিশীথ তার কথা শেষ করতে পারলো না। মালতী বললো, 'তোমরা গল্প করো রবিদা, আমার শরীর ভালো লাগছে না।' দ্রুত পায়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মালতীর এই ব্যাপারে অত্যন্ত রাগ হলো নিশীথের। মালতী তাকে ভাবে কী? তার প্রতি মলতীর অন্তত এটুকু শ্রদ্ধা থাকা উচিত ছিলো যে নিশীথ রায় তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে বলেই সে কাঙাল নয়। যে-কোনো সমাজে যে-কোনো মেয়েকেই নিশীথ রায় চোখের পলকে অর্জন করতে পারে। চোখ-মুখ তার মুহূর্তে লাল হ'য়ে উঠলো। রবির সঙ্গে আর-একটা কথা না-বলেই বেরিয়ে এলো রাস্তায়।

মিল্লির প্রতি তার দুর্বলতা ছিলো, কিন্তু তাকে সে বিবাহ করবে এ-কথা এর আগে আর তার কখনো মনে হয়নি। এবার মনে-মনে বিশ্লেষণ করলো সে। পাত্রী হিসেবে সবদিক থেকেই মিলি মালতীর চাইতে অনেক উপরে। আর অত সুন্দরী স্ত্রী পাওয়া গেলে কোন মূর্খ তা হাতে ঠেলে? আর ঐ সব প্রতিদ্বন্দ্বী? তাদের কাছে সম্মান রাখার জন্যও তার মিলিকেই বিয়ে করা উচিত। নিশীথ রায়কে হাতের কাছে পেয়েও যদি কোনো মেয়ে অন্যকেই মাল্যদান করলো, তাহ'লে তার চেয়ে বড়ো পরাজয় আর কী থাকতে পারে?

পরের দিন সে প্রায় সমস্তক্ষণ ঘুরে বেড়ালো একটি সম্ভাবিত চাকরির আশায়। কিছুদিন আগে এক বন্ধু তাকে আবেদন করতে বলেছিলো। নিশীথ হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলো। 'হ্যাঁ, তোমার যত কথা! অত বড়ো চাকরি আমার জন্যে নয়—আর প্রধান কথা, চাকরির জন্যেও আমি নই। পৃথিবীতে মোটা টাকা উপার্জনের চাইতেও যে মহৎ কাজ আছে—সেটা তোমার মাথায় ঢুকবে না।'

বন্ধু বললে, 'আমি বলছি তুমি অ্যাপ্লাই করো—নিশ্চয়ই পাবে। পাব্লিসিটির কাজ। তোমার মতো লোকই ওরা চায়, আর তাছাড়া চাকরিটা একেবারেই আমার বাবার হাতে।'

পিঠ চাপড়ে নিশীথ বেরিয়ে এলো। দশটা-পাঁচটা যদি চাকরিই করবে তবে লিখবে কখন? চাকরিটা সে না করলে অন্য কেউ করবে, কিন্তু তার বিনিময়ে তো কোনো লেখক পওয়া যাবে না!

এবার নিশীথ চেপে ধরলো সেই বন্ধুকে। চাকরিটা প্রায় বেহাত হ'য়ে গিয়েছিল—নিশীথ রায় এবার তার সবটুকু প্রতিপত্তি খরচ করলো এর জন্যে। বড়ো-বড়ো ভক্ত ও বন্ধুর সংখ্যা তার নিতান্ত কম ছিলো না—সকলের চেষ্টায় অবশেষে সে পেলো চাকরিটি।

অভিনন্দন জানালো প্রথমে খাস্তগীর পরিবারই। এবং চাকরির অনারে একদিন নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন তাঁরা। নিশীথ সগৌরবে ট্যাক্সি চ'ড়ে গিয়ে নিমন্ত্রণ খেয়ে এলো। কিছুদিন পরেই শোনা গেল, মিলি খাস্তগীর নিশীথ রায়ের সঙ্গে এনগেজ্‌ড্‌ হয়েছেন। খবরের কাগজে ছবি-সহ খবরটি বেরুলো।

কিন্তু কাগজে বেরুবার আগেই খবরটা বাড়িতে আনলো বাড়িওয়ালা গিন্নির বড়ো ছেলে। হয়তো মালতির প্রতি তার কোনোরকম দুর্বলতা ছিল। রবিকে ডেকে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই সে খবরটা পরিবেশন করলো। রবির মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠলো। মালতী দু'হাতে মুখ ঢাকলো। রবি বললো, 'আমি, যাবো তার কাছে। তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করবো, তার কি কোনো হৃদয় নেই—হৃদয় নিয়ে খেলা করাই কি তার পেশা?'

'রবিদা, কক্ষনো না—কক্ষনো না—' মালতীর ভাঙা-ভাঙা গলার শব্দ অদ্ভুত শোনালো। 'সব সইবে—অপমান সইতে পারবো না।' উচ্ছ্বসিত কান্নার বেগে সে থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো।

'কাঁদিসনে বোন, কাঁদিসনে।'—নিচু হ'য়ে রবি ওর মাথায় হাত রাখলো।

এদিকে আস্তে-আস্তে বিয়ে-বাড়িতে একটি মৃদু কোলাহল আরম্ভ হ'লো। মিলি বললে, 'আমি তো ঘুম ভেঙেই দেখি নেই।'

চিন্তিত মুখে মিলির মা বললেন, 'বেলা বাজলো আটটা, কত সব অনুষ্ঠান রয়েছে এখনো—এ কী অদ্ভুত ছেলে বাবা।'

'জানা কথাই—' মিলির বাবা ঢিলে পাজামার উপর পাঞ্জাবি চড়াতে-চড়াতে বললেন, 'এ সমস্ত লেখকগুলোকে আমি কখনোই বিশ্বাস করি না। রস্টিক! বর্বর! একশো বার বারণ করলুম—না, মা আর মেয়ে একেবারে ক্ষেপে গেলেন—'

মিলি ড্রেসিং টেবিলের সামনে ব'সে প্রসাধন করছিলো, মুখ ফিরিয়ে বললে, 'ছ'শো টাকা মাইনের চাকরিটা পাওয়া মাত্র তো

সবচেয়ে বেশি তুমিই ক্ষেপলে—আর লেখকদের উপর তোমারই ভালোবাসাটা একটু বেশি মাত্রায় ছিলো—'

'এখন তো বলবেই—যত ইডিয়ট জানোয়ার'—পিছন থেকে মিলির মা তাঁর পাঞ্জাবির কোণ ধ'রে টান দিলেন। ফিরে তাকিয়ে দেখা গেলো বাংলা দেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক নিশীথ রায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে দরজায় হেলান দিয়ে—মুখ দেখে মনে হ'লো এ-পৃথিবীর কোনো কথাই যেন তার কানে পৌঁচচ্ছে না।

মেয়েটার তো এমনিতেই মতিগতি ভালো না, তার উপর এক উপসর্গ জুটলো। সুরমা দেবী একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়লেন। স্বামীকে বলা না-বলা সমান—অবশেষে একদিন নিজেই কোনো-এক নিভৃত অবকাশ সৃষ্টি করে বরুণকে বললেন কথাটা। কথাটা বলতে যে তাঁরই ভালো লেগেছিলো তা নয়—মানুষের মনে ব্যথা দেবার মতো রূঢ় অন্তঃকরণও নয় তাঁর, কিন্তু মা হয়ে তাঁর তো সন্তানের মঙ্গলটাই বড়ো করে দেখা উচিত।

'ছাখো বাবা'—অনেক ইতস্তত করে, অনেক দ্বিধা করে এইভাবেই কথাটা উত্থাপন করলেন তিনি—'জানো তো এই পোড়া বাঙালি সমাজ! লোকেদের তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজকর্ম নেই, কেবল এর-ওর ত্রুটি দেখে বেড়ানোই স্বভাব।—এই পর্যন্ত বলেই তিনি থামলেন—ঈষৎ চিন্তিতমুখে ভাবতে লাগলেন আসল কথাটা বলেন কী করে।

কিন্তু এইটুকুতেই বরুণের মুখ লালচে দেখালো—কয়েক দিন থেকেই ভদ্রমহিলার ব্যবহার তার কাছে একটু কেমন কেমন ঠেকেছে—সে এলেই ইনি যেন অতিমাত্রায় বিব্রত হয়ে ওঠেন—আর যতক্ষণ যে-ভাবে পারেন মেয়েকে আড়াল করে রাখেন তার কাছ থেকে। আত্মসম্মানে লেগেছে বরুণের, কিন্তু তবুও সূর্য যখন অস্ত যাবার মুখে একটু দাঁড়ায়—তার মেস্-এর অপরিসর ঘরের পশ্চিমের জানালা দিয়ে যখন ছড়িয়ে দেয় শেষ আভা—তখনই যেন তার মন কেমন করতে থাকে এখানে আসবার জন্য। অনেকদিন দৃঢ়-সংকল্প হয়ে বেরিয়ে গেছে

সে উল্টো দিকে, কিন্তু তারপর একসময় নিজেকে আবিষ্কার করেছে সে এই বাড়ির দরজায়। লজ্জায়, সংকোচে চোখ তুলতে পারেনি—একটি অতি প্রিয় সান্নিধ্যের অস্তিত্বে কেবলি থেকে-থেকে কেমন করে উঠেছে বুকের মধ্যে। আজকের ভূমিকা যে কিসের সূচনা, এটা বুঝতে তার বিলম্ব হলো না।

দু একবার কেশে বললো, 'সে তো ঠিকই।'

'তাই বলছিলাম কী—' বলবার একটা রাস্তা পেলেন সুরমা দেবী। 'তোমার গিয়ে—এই—অমিতা তো খুব ছোটো মেয়ে নয়! —বরুণের মাথা আরো নিচু হলো,—'তাছাড়া ওর একটা বিয়েও স্থির কবা হয়েছে—ছেলেটি খুবই উপযুক্ত।'—এখানে সুরমা দেবী তাঁর ভাবী জামায়ের গর্বে আগের কথার খেই হারিয়ে ফেললেন—মুখ থেকে নিমেষে সংকোচের রেখা মিলিয়ে গেলো তাঁর—হাসিমুখে বললেন, 'অমিতার কপাল ভালো—ছাখো, ছেলেটি বি, এ, পাশ করে বিলেতে গেছে, কলকাতা শহরে দুখানা বাড়ি ভাড়া খাটছে—দস্তুরমতো অবস্থাপন্ন লোক। ছেলেটির বাবা ছিলেন সব্‌জজ। তা ছাখো, এক জীবনে তো কম টাকা করেননি—ছেলেপুলেও আরো আছে।'—

কী কথায় কী-কথা এলো—অমিতার বিবাহের সমস্ত খুঁটিনাটি শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয়ে একসময় উঠে দাঁড়ালো বরুণ। ছোটো একটু হাই তুলে বললো, 'আচ্ছা, আমি আসি, মাসিমা।'—

'হ্যাঁ, তাই বলছিলাম কী'—সচেতন হয়ে সুরমা দেবী আবার আগের কথায় এলেন। অদৃশ্য হতে হতে বরুণ বললো, 'সে আমি বুঝেছি।'

তেতলার ফ্ল্যাট থেকে একতলায় নামতেই দেখলো, অমিতাও

রাস্তা থেকে এগিয়ে আসছে দ্রুত পায়ে—কোথায় গিয়েছিলো ? হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে দুজনেই একটু থমকে দাঁড়ালো।

লজ্জিতা মুখে অমিতা বললো, 'যাচ্ছেন যে ?'

'কাজ আছে।'

'বিকেলবেলা আবার কাজ কী ?'

'থাকতে নেই ?'

'থাকতে পারে, কিন্তু নিতে নেই।'

'কেন ?'—অমিতার মুখের উপর চোখ রাখলো বরুণ—অমিতা মৃদু হেসে মুখ নিচু করলো। 'কেন'র অর্থ তারা দুজনেই মনে মনে জানে—মুখোমুখি তারা অনগ্রসর, কিন্তু মনে মনে তারা যে কত কাছের মানুষ, তার সাক্ষী তাদের চোখ—তাদের মনের ব্যাকুলতা। হঠাৎ বরুণ যাবার জন্য পা বাড়িয়ে বললো, 'আচ্ছা চলি।' সমস্ত মধুরতা আহত-হলো বরুণের এই ব্যবহারে। মুখ ভারি করে অমিতা বললো, 'এত কাজের মানুষ হয়ে উঠলেন কবে থেকে ?'

'আজ থেকেই।'—একবারও আর চোখ না-ফিরিয়ে বরুণ রাস্তায় নেমে গেলো। অমিতা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো কতক্ষণ—হাতের ডালমুটের ঠোঙাটার দিকে তাকিয়ে একটা নিশ্বাস নিলো, তারপর অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেজাজে রাস্তার উপর সেটা ছুঁড়ে ফেলে রুমালে হাত মুছে উপরে উঠে এলো।

গিয়েছিলো কোনো বন্ধুর বাড়ি। ইচ্ছে ছিলো না—সুরমা দেবীই বললেন, 'যা, ঘুরে আয়—কত ভালোবাসে—কতবার আসে—আর তোর কেবল কোণঘুপ্টি হয়ে বাড়ি বসে থাকা। আসলে বরুণের সঙ্গে নিভৃত হবার জন্যই যে মায়ের এত গরজ, তা অমিতা কি করে জানবে। সে এমনিতেই ঘরমুখো মেয়ে, আর আজকাল

যে-নিবিড় মাধুর্যের আস্বাদে তার হৃদয় পরিপূর্ণ, তাতে তো বাইরের সংযোগ তার কাছে নিরর্থক। তবু সে গেলো। কেবল মা-র অনুরোধেই নয়—ঔচিত্যবোধেও খানিকটা। মেয়েটি তার অন্তরঙ্গ সহপাঠিনী। ডায়োসেসন থেকে গেলো বছর তারা একসঙ্গে আই. এ. পাশ করেছিলো। একই পাড়ার অধিবাসী—আসে সে প্রায়ই, কিন্তু অমিতার আর যাওয়া হয়ে ওঠে না। তাছাড়া আরো একটি কারণ, এই ডালমুট। মার্কেট ছাড়াও যে অন্যত্র ডালমুট পাওয়া যায়, এ-খবরের সন্ধান এই মেয়েটিই জুগিয়েছিলো। তাদের বাড়ির পাশেই দোকানটি—আলাপি লোক,—খাতিরে খুব ভালো জিনিশই দেয়। বরুণ অসম্ভব ভালোবাসে ডালমুট খেতে। অমন সলজ্জ মানুষটি এই একটি বিষয়েই পরম অকুণ্ঠ।

এত তাড়াহুড়ো করে সে এলো কেন? এইজন্য? ঘরে ঢুকে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে মনের মধ্যে একটা সুতীব্র অভিমান তাকে অত্যন্ত আঘাত দিলো। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে—তার সঙ্গে এখনও মা-র দেখা হয়নি—হয়তো তিনি রান্নার ব্যবস্থায় বিব্রত। ভালোই। এত তাড়াতাড়ি এসে মা-র মুখোমুখি দাঁড়াতে তার কেমন লজ্জাই করছিলো, কী ভাববেন তিনি—এত কাল পরে বন্ধুর বাড়ি গিয়ে একটা সন্ধ্যাও সে কাটাতে পারে না কেন আজকাল? যদিই বা মা-র মনে এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে! কাপড় ছেড়েও সে ঘর থেকে বেরুলো না, জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো। চকিতে একটা কথা মনে হলো তার। বাবুর রাগ হয়েছে। রোজই তো থাকি—একটা দিন এসে দেখতে পাননি তাতেই এত রাগ! কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই অমিতার ক্ষুব্ধ মন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। সেই মুহূর্তেই তার হাত-পায়ে লঘুগতি

ফিরে এলো—একা ঘরেই অত্যন্ত সলজ্জ হয়ে উঠলো সে। থেকে-থেকেই কানটা কেবল গরম হয়ে উঠতে লাগলো।

বরুণ অবনীবাবুর ছাত্র। যদিও এখন আর নয়, কেননা এক বছর হলো সে ছাত্রাবস্থা উত্তীর্ণ হয়ে নোঙর-ছেঁড়া নৌকোর মতো এদিক-ওদিক চাকরির চেষ্টায় উদ্‌ভ্রান্ত। অবনীবাবুও কলেজ ছেড়ে বিজ্ঞাপন আপিশের গদি-আঁটা চেয়ারে সমাসীন। তবু কোনো-একদিন হঠাৎ গাড়ি চাপা দিতে-দিতে ছাত্রটিকে আবিষ্কার করে অত্যন্ত সুখী হলেন তিনি। নিয়ে এলেন বাড়িতে, চায়ের পর্বটা খুব ভালোরকমেই হলো। চিরকালই যে এ-রকম একটা আপিশের ভোঁতা বড়োবাবু ছিলেন না—এ-কথা মনে পড়ে তাঁর বেশ ভালোই লাগলো। হাজার হোক, একটা প্রোফেসর আর বড়োবাবুতে ঢের তফাৎ,—বিদ্যাহীন হলে প্রোফেসর হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু বড়োবাবু হবার পক্ষে এই বিদ্যাবত্তার কি কোনো বিশেষ মর্যাদা আছে! তিনি যে একদিন ইংরিজির একটি তুখোড় ছাত্র ছিলেন—একদিন ফার্স্ট হয়ে যে আত্মীয়-বন্ধুর মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন, সে-সব আজ কে বিশ্বাস করবে। তাই দৈবাৎ একটি-আধটি পুরানো ছাত্র দেখলেই তাঁর কেমন একটা উত্তেজনা হয়।

বরুণের অবস্থা ভালো নয়—সংসারের চাপে সে রুদ্ধশ্বাস। রিসার্চ স্কলারশিপের একশোটি টাকা তার ঐ সংসার-সমুদ্রে একটি বুদ্‌বুদের মতো। বিবাহের স্বপ্ন একদিনের জন্যেও যে তার মনকে উতলা করেনি এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়—কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাবার তার সময় ছিলো না। মেস্‌-এর ঐ ছোটো ঘরটির চারটি দেয়ালেই যেন তার জীবন চির-আবদ্ধ হয়ে ছিলো—হঠাৎ সেই দেয়াল ভেঙে গেল অমিতাকে দেখে। বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে ভাবলো,

ঈশ্বর, যখন তুমি দাও, অকৃপণ হয়েই দাও, তা নইলে আমার মতো এই হতভাগ্যের অদৃষ্টেও এই নীরন্ধ্র আনন্দ জুটলো কেমন করে!

অবনীবাবু আশা দিয়েছিলেন, তাঁর আপিশে শিগগিরই একটি আসন খালি হচ্ছে—যদিও বরুণের মতো মুখ-চোরা নির্ঝঞ্ঝাট মানুষের পক্ষে শিক্ষকতাই ছিলো উৎকৃষ্ট পথ, কিন্তু তাতে পেট ভরে না—একশো টাকার জায়গায় একশো-পঁচাত্তরও তার কাছে লোভনীয়। প্রথম-প্রথম উমেদার হয়েই যাওয়া আসার সেতু রচনা করেছিলো সে, কিন্তু অবনীবাবু তাকে সন্তানের মর্যাদা দিলেন। অমিতার সঙ্গে অবাধ মেলামেশায় তাঁর রইল আন্তরিক প্রশ্রয়। যে-মেয়ের পাঁচ মাস ধরে বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, আর যার দু' মাস বাদে বিয়ে, তাকে অনায়াসেই ছেড়ে দেওয়া যায়। এই পাঁচ মাসে একটি বাঙালি মেয়ে চোখে না দেখলেও যে তার ভাবী স্বামীকে ধর্মসঙ্গতভাবে ভক্তি করবে, ভালোবাসবে, এ-বিষয়ে তাঁদের স্বামী-স্ত্রী কারো মনে কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

কিন্তু অমিতা একটু অদ্ভুত বইকি, বিয়ে সম্বন্ধে সে নিতান্তই গন্ত—এ বিয়ে ঠিক করবার আগে আরো দু'বার সুরমা দেবীর ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যর্থ করেছে সে। বিয়ের কথা উঠলেই তার কেমন একটা বদহজমের মতো অনুভূতি হয়—কিছুতেই একটা কল্পিত স্বামীকে ঠিক মনের সঙ্গে সে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, আসলে কেন জানি ছেলেবেলা থেকেই তার বিয়ের প্রতি একটা স্বভাব-বৈরাগ্য। নানা সমাজের নানা লোকের সঙ্গেই মেশামেশির প্রচলন এ বাড়িতে। দুএকবার সুরমা দেবীর মনোমতো দু-একটি ছেলে এ-বাড়িতে ঘুরঘুরও করেছে—কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! অবশেষে

আই-এ পাশ করবার পরে সুরমা দেবী জোর করেই বিয়ে ঠিক করে ফেললেন। অমিতা হাঁফ ছাড়লো।

যাকগে, প্রেমপ্রার্থীদের অত্যাচার থেকে তো রেহাই পাওয়া গেলো। তাছাড়া, সে লোকটা আছে কোন দূর দেশে—চাই কি রুচি-টুচি ভালো থাকলে একটি বিদেশিনীকেও বিয়ে করে ফিরতে পারে!

ছ'মাস আগে যখন বরুণ এলো আর বাবা যখন আলাপ করিয়ে দিলেন, মানুষটার দিকে তাকিয়েই তার ভালো লেগেছিলো। প্রথম পরিচয়ের গণ্ডী এড়িয়ে কত অনায়াসেই যে তারা অত্যন্ত কাছের মানুষ হ'য়ে উঠলো, সে-কথা ভাবলে অমিতার একটু অবাকই লাগে। কেন এমন হয়? পৃথিবী ভরা কত-কত লোকের মধ্যে হঠাৎ কেন একটা মানুষকেই অমন অন্তরঙ্গ মনে হয়? কেন? কেন? এই কেন প্রশ্নটি চিরন্তন এবং এর কোনো জবাব নেই।

সন্ধ্যারও অনেক পরে মা আর মেয়ে মুখোমুখি হলো। ঘরে ঢুকে অন্ধকারে মেয়েকে ব'সে থাকতে দেখে সুরমা দেবী অবাক হয়ে বললেন; 'সে কী রে? কখন এলি? অন্ধকারে ব'সে আছিস কেন?'

নিতান্ত সংকুচিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো অমিতা, ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে বললো, 'এই তো এখুনি—'

একটি সুখবর আর চাপতে পারলেন না সুরমা দেবী, 'এইমাত্র তোর শ্বশুরের একটা চিঠি পেলাম রে,' আড়চোখে তিনি মেয়ের মুখ নিরীক্ষণ ক'রে বিরক্ত হলেন। মেয়েটা যেন কী! স্বামীটা পড়ে আছে (ভাবী স্বামীও যা স্বামীও তা-ই, সুরমা দেবীর এই মত) কোনো দূর দেশে, একটা খবরের জন্য তো কোনো উৎকণ্ঠা নেই-ই,

খবর দিতে এলেও জানবার উৎসাহ নেই। ঈষৎ অপ্রসন্ন মুখে বললেন, 'মুখটা অমন গোমরা করে আছিস কেন?'

'কই, না তো!'—অমিতা উঠে গিয়ে আলো জ্বালালো।

সুরমা দেবী বললেন, 'সুবোধ তো আগামী সপ্তাহেই রওনা হচ্ছে। ধর, আসতে-আসতে এক মাস। এক মাস আর কী সময়—একটা পলক।'

'মা, গা ধুয়ে আসি'—মা-র কথা যে অমিতার কর্ণগোচর হলো, এমন-কোনো আভাসই পাওয়া গেলো না—আলনা থেকে কাপড়-জামা নিয়ে সে পাশের দরজা দিয়ে বাথরুমে ঢুকলো।

পরের দিন কিন্তু বরুণ এলো না—পরের দিনও না, তার পরেও না। কি হলো? অমিতার মনের মধ্যে এক দুঃসহ প্রতীক্ষা প্রতি-মুহূর্তে সচকিত হতে লাগলো, দিনরাত গেলো ব্যর্থ হয়ে—জীবন থেকে সমস্ত আনন্দ কে যেন হাত বুলিয়ে মুছে নিলো। সুরমা দেবী পড়লেন আর-এক মুশকিলে। চোখে-চোখে রাখেন মেয়েকে, দুদিন সিনেমায় নিয়ে যান—আজ এ-শাড়ি কিনে দেন, কাল ঐ জুতো—কিন্তু তবু অমিতার মুখে প্রসন্নতা আনতে পারেন না।

এতদিনে ভাবী জামাই রওনা হয়েছেন লণ্ডন থেকে—এসে পড়লো বলে, কী যে করবেন তিনি!

এর মধ্যেই একদিন আবার বরুণকে দেখা গেলো। অবনীবাবু আপিশ থেকে এসে কোথায় বেরিয়েছেন—সুরমা দেবীর শরীর ভালো ছিলো না—শুয়ে ছিলেন। অমিতা বসবার ঘরে ব'সে বই পড়ছিলো—ভেজানো দরজাটি ঈষৎ ফাঁক হ'লো—তার পরেই পরদা ঠেলে বরুণ ঘরে ঢুকলো। বরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে

অমিতার বুকের স্পন্দন এত দ্রুত হ'লো যে কতক্ষণের জন্য সে মূহ্যমানের মতোই ব'সে রইলো—একটু পরে বললো, 'আসুন।'

'আপনার বাবা বাড়ী নেই?'

'না।'

'কখন ফিরবেন, জানেন?'

'না।'

'তাহ'লে—'

'তাহ'লে যাবেন, এই তো?' ঠাশ ক'রে বই বন্ধ করে হঠাৎ অমিতা উঠে দাঁড়ালো। বরুণ বোকা নয়, এই অভিমানের অর্থ বোধগম্য হতে তার সময় লাগলো না—কিন্তু সুরমা দেবীর উপদেশ তার ভুলে যাবার কথা নয়—সে পুরুষ, নিজেকে দমিত করবার সৎসাহসটুকু তার থাকা উচিত, কিন্তু তবু তার চোখ ক্ষণেকের জন্য থেমে রইলো অমিতার মুখের উপর—সমস্ত দৃঢ়তা—অনেক প্রতিজ্ঞা—অনেক বিনিদ্র রাতের অনেক শপথ সমস্ত ভুলে গিয়ে বসলো সে,—একটু চুপ করে থেকে বললো, 'যদি তাড়িয়ে না দেন তাহ'লে যাবো কেন?'

অমিতা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো, জবাব দিলো না।

'বসুন না।'—বরুণ বললো।

একটু চুপ করে থেকে অমিতা বললো, 'এতদিন আসেননি কেন?'

'সময় পাইনি।'

'এও কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?'

'কেন, আমি কি যথেষ্ট কাজের মানুষ নই?'—কথার সুরকে একটু হালকা করবার চেষ্টা করলো বরুণ।

অমিতা গম্ভীরমুখে বললো, 'যথেষ্ট কাজের মানুষ হলে কাজ করেও দেখাশুনো করবার সময় থাকতো।'

'দেখুন, আমাদের মতো দরিদ্রের কথা আপনি বুঝতে পারবেন না—হঠাৎ একটা খোঁচা দেবার লোভ বরুণ সামলাতে পারলো না। আসলে সুরমা দেবীর ঝালটা সে অমিতার উপরেই মেটাবার চেষ্টা করলো—আপনাদের মতো গণ্যমান্য বন্ধুদের সঙ্গে সংশ্রব রাখতে হলে যা-যা উপকরণ দরকার, তার সিকি ভাগ সংগ্রহ করবার যোগ্যতাও আমার নেই। তাছাড়া, দু'দিন বাদে আপনি একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের বৌ হচ্ছেন—যার-তার সঙ্গে মেলামেশাটা আপনারও কি শোভা পায়?'

আশ্চর্য হলো অমিতা। চকিতে বরুণের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়ে বললো, 'কি আর বলবো—নিজে যা মনে করেন তা-ই যদি আপনার চরম সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়—তা'হলে তা-ই ভাবুন।'

অমিতার কথার স্বরে বরুণের মন কেমন করলো। লোভ গেলো অন্তরঙ্গ হবার—কিন্তু সংসারে অনেক নিষ্পেষণে অভ্যস্ত সে—এ-লোভ জয় করে সে খুব সহজ হয়ে বললো, 'আপনার বাবার বোধ হয় অনেক দেরি হবে আসতে—আমি উঠি।'

বরুণের ব্যবহারে অমিতার চোখ ঝাপসা হলো। অস্পষ্ট গলায় বললো, 'তা-ই ভালো।' উঠে দাঁড়ালো বরুণ—বললো, 'উনিই আমার আসবার জন্যে খবর দিয়েছিলেন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমি একটা চাকরির আশায়ই রোজ এখানে আসতুম।'

তার মনের কোনোখানেই যে অমিতা ছিলো না, অমিতা নেই, এ-কথাটা প্রমাণ করবার জন্য সে যেন আজ বদ্ধপরিকর।

অমিতা মুখ না-তুলেই বললো, 'জানতুম না, জানলুম।'

দরজা পর্যন্ত বরুণকে এগিয়ে দিয়ে সে ফিরছিলো—যেতে-যেতে একটু থমকে দাঁড়িয়ে বরুণ বললো, 'শুন্নুন।'

অমিতা মুখ ফেরাতেই বললো, 'যদি কোনো অপরাধ করে থাকি, ক্ষমা করবেন। আর আপনার বাবাকে বলবেন, কাল আমি ছুটোর সময় আপিশে গিয়েই তাঁর সঙ্গে দেখা করবো।'

কঠিন হয়ে অমিতা বললো, 'আজও তো সেখানেই যেতে পারতেন!'

'পারতুম', কিন্তু বড়ো আসতে ইচ্ছে করলো।—দ্রুত পায়ে নেমে গেলো সে, আর স্তব্ধ হয়ে অমিতা দাঁড়িয়ে রইলো দরজা ধরে।

এতক্ষণ ধরে একটা গুনগুনানি শুনতে পাচ্ছিলেন সুরমা দেবী। খোঁজ করে যে-মুহূর্তে জানলেন বরুণ এসেছে, সেই মুহূর্তেই উঠে এলেন এ-ঘরে। মেয়েকে দরজা ধরে অমন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁর বুকের মধ্যে যেন একটা ধাক্কা লাগলো। কাছে এসে বললেন, 'কী করছিস দাঁড়িয়ে?'

অমিতা সচকিত হয়ে দরজা বন্ধ করে এসে বসলো।—'বরুণবাবুকে বাবা খবর পাঠিয়েছিলেন আসবার জন্যে, তাই এসেছিলেন।'

'চলে গেলো?'

'হুঁ।'

'তা'হলে বেশিক্ষণ বসেনি!'—সুরমা দেবী যেন হাঁফ ছাড়লেন।

'না, বাবা নেই শুনেই চলে গেলেন।'

মনে-মনে বরুণের প্রশংসা করলেন তিনি—সঙ্গে সঙ্গে নিজের বুদ্ধিকেও তারিফ করলেন আর সেই সঙ্গে অবনীবাবুকে অভিসম্পাত

করলেন। ছেলেটাকে আবার ডাকাডাকি করে আনবার দরকার ছিলো কী !'

মুখে বললেন, 'অনেক দিন পরে এলো, কেমন আছে ?'

বইয়ের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে অমিতা জবাব দিলো, 'ভালোই।'

একটু চুপচাপ থেকে নিজে থেকেই সুরমা দেবী বললেন, 'বোধ হয় চাকরি-টাকরির জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বড়ো গরীব বেচারা !'

'গরিব-গরিব করছো কেন মা'—আচমকা চ'টে উঠলো অমিতা। —'খেতে পায় না তা তো নয় ! আর মাথায় যখন বিদ্যে-বুদ্ধি আছে তখন আর চিরকালই কিছু এ-ভাবে যাবে না।' ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলেই অত্যন্ত লজ্জা বোধ করলো সে। তাড়াতাড়ি কাছে এসে মা-র গলা জড়িয়ে ধরে বললো, 'গরিবই হোক, ধনীই হোক— পরের কথায় আমাদের কাজ কী মা ! চলো তুমি শুয়ে থাকবে। তোমার না শরীর খারাপ হয়েছে !' সুরমা দেবী নিঃশব্দে মেয়ের হাত ধরে উঠে এলেন। কথাটা গিয়ে তাঁর মর্মস্থানে বিদ্ধ হয়ে রইলো।

এর দু'সপ্তাহ পরে খবর পাওয়া গেলো, সুবোধ পা দিয়েছে ভারতবর্ষের মাটিতে। অবনীবাবু অত্যন্ত আনন্দ বোধ করলেন। আজ পাঁচ মাস ধরে এই মানুষটির প্রতি তাঁর একটি স্নেহ লালিত হয়েছে ভিতরে-ভিতরে—একে তিনি টাকা পাঠিয়েছেন, চিঠি লিখেছেন—চোখে না-দেখলেও জানেন যে এ-সংসারে স্ত্রী আর কন্যার পরে এই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ভালোবাসার ধন। সুরমা দেবীর মুখ দেখে কিছু বোঝা গেলো না—মেয়ের বিষণ্ণতাই তাঁর সহাস্য মুখে ছায়া ফেলে রাখলো।

যেদিন সুবোধের কলকাতা আসবার খবর পাওয়া গেলো তার আগের দিন আর অবনীবাবু ঘুমোতে পারলেন না। আপিশ কামাই করে বাড়ি-ঘরের সংস্কারেই দিন কাটলো। সুরমা দেবীরও বিশ্রাম নেই—আজ না হোক দুদিন পরে এই তো তাঁর সবচেয়ে আপন জন—মনের মধ্যে একটা স্নেহের আস্বাদ উপভোগ করতে লাগলেন তিনি। কোথায় শোবে, কী খাবে, কী-কী করবে—স্বামী-স্ত্রী ভাবী জামাতার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যেন একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়লেন।

মাত্রই একদিনের ব্যাপার! কলকাতা হয়ে সে যশোরে তার বাবার কাছে যাবে—এতেই অবনীবাবু বিস্তর টাকা খরচ করে ফেললেন।

অবশেষে সুবোধ এলো। মেয়েকে সতেরোবার করে নানারকম উপদেশ দিতে লাগলেন সুরমা দেবী—আলমারি খুলে বারে-বারে নানারকম শাড়ি বার করে দিলেন পরবার জন্য। এই ওদের প্রথম দেখাশোনা—এই তো শুভদৃষ্টি।

অমিতা কোনো অবাধ্যতা করলো না, গণ্ডগোল করলো না, সমস্ত দিন মায়ের নির্দেশ মেনে-মেনে চললো। আলাপ করলো সুবোধের সঙ্গে। সুন্দর শাড়ি পরে নতমুখে খাবার পরিবেশন করলো—সুরমা দেবী চোখ ভরে দেখলেন আর ভাবলেন, মেয়েটাকে পাগল বলি, যা-ই বলি আসল বুদ্ধিতে কিন্তু ঠিক আছে।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকক্ষণ কথাবার্তা হলো। সুবোধ ব্যারিস্টার হয়ে এসেছে, প্রথম বসতেই অনেক খরচ। তার কিছু-কিছু তালিকাও সে শ্বশুরকে জানিয়ে রাখলো। তারপর এক সময় নিভৃত হ'লো অমিতা, আর নিজের নির্জন ঘরে একলা হয়েই দুই চোখে তার বন্যা নামলো। বালিশে মুখ গুঁজে সে যে কত কাঁদলো

তার যেন শেষ নেই। সত্যি যে তার বিয়ে হবে এ-কথা যতবার মনে পড়লো, ততবার নতুন ক'রে চোখ ভ'রে-ভ'রে জল এলো তার। আর তারপর সমস্ত রাত তার ঘুম্ হ'লো না,—একটা দুঃসহ কষ্টে বুক যেন একেবারে ভারি হ'য়ে গেলো।

পরের দিন বিকেলের ট্রেনে সে আর তার বাবা গেলো সুবোধকে তুলে দিয়ে আসতে—ফেরবার পথে হঠাৎ অবনীবাবু গাড়ি থামিয়ে ডাকলেন, 'এই যে বরুণ, শোনো শোনো।' অন্যমনস্ক হ'য়ে ছিলো অমিতা—সহসা চকিত হ'য়ে বাইরের দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলো। বরুণের চেহারা এত খারাপ হয়েছে কেন? মাথার চুল উস্কোখুস্কো—মুখ শুকনো। কাছে আসতেই অবনীবাবু বললেন, 'এ কী, তোমাকে এ-রকম দেখাচ্ছে কেন? অসুখ-বিসুখ করেনি তো?' 'এই সামান্য—' স্বভাবসুলভ কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে গাড়ির দরজা ধ'রে দাঁড়ালো সে।—'তুমি সেদিন দুপুরে গিয়েছিলে আপিশে, কিন্তু আমি এত ব্যস্ত ছিলুম—' গাড়ির দরজা খুলে অবনীবাবু ডাকলেন, 'এসো না ভিতরে।'

'না, না—' অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো বরুণ।

'এসো, এসো,—এদিকে একটু স'রে আয়, অমিতা।' একরকম জোর ক'রেই তিনি বরুণকে গাড়িতে তুললেন। বললেন, 'তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার ছিলো আমার। প্রথম কথা, তোমার ও-চাকরিটা খুব শিগ্‌গিরই খালি হবে, আর প্রধান কথা, তার চেয়েও একটি ভালো চাকরির খবর আমি পেলুম কালকে। আমার মনে হয়, তুমি যে-ধরণের ছেলে, তাতে মাস্টারির লাইনটাই তোমার উপযুক্ত। যে-কলেজে চাকরিটি খালি হয়েছে, তার কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও আমার যথেষ্ট আলাপ আছে, তাছাড়া প্রিন্সিপ্যাল আমার বন্ধু।'

কৃতজ্ঞতায় বরুণের বুকের ভিতরটা যেন ভ'রে উঠলো। হাতে হাত ঘষতে-ঘষতে বললো, 'আপনি—আপনার—'

অবনীবাবু বললেন, 'থাক, থাক্।' একটু পরে বললেন—'এ-ক'দিন আমি ভয়ানক ব্যস্ত ছিলুম—জামাই এলেন বিলেত থেকে, এই তো তাকেই সী-অফ ক'রে এলুম।'—মুহূর্তে অমিতা মুখ তুলে তাকালো বরুণের দিকে, বরুণ চোখ ফিরিয়ে নিলো। অমিতাকে ডিঙিয়ে অবনীবাবু বরুণের পিঠে হাত রেখে বললেন, 'বিয়ের সময় কিন্তু ফাঁকি দিলে চলবে না—কাজকর্ম করতে হবে—' বরুণ চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলো, ভদ্রতা ক'রেও জবাব দিতে পারলো না।

অবনীবাবু বরুণের কোনো কথা শুনলেন না, সোজা তাকে নিয়ে বাড়ি এলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে সবে—ফিরে দেখলেন সুরমা দেবী বাড়িতে নেই। আজকাল প্রায় প্রতি বিকেলেই তিনি বাড়ীতে থাকেন না; মেয়ের বিয়ে, এখন থেকেই তিনি নানান সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এ-পাড়ার সব দোকানের সব শাড়িই হয়তো দেখছেন তিনি, কিম্বা সকল ডিজাইনের গয়না। তবু তাঁর দেখা ফুরোয় না।

বাড়ি এসেই অমিতা নিজের ঘরে ঢুকলো। সমস্ত শরীর যেন তার কেমন দুর্বল হ'য়ে গেছে—সহ্য করতে পারছে না সে বরুণের সান্নিধ্য। একটু পরেই ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে অবনীবাবু ঘরে ঢুকলেন, 'এই, তুই গিয়ে একটু বোস তো বরুণের কাছে—আমি চট ক'রে স্নানটা সেরে আসি। আর একটু খাবারটাবার দিস্।'—শীত গ্রীষ্ম বারোমাস তাঁর বিকেলে স্নানের অভ্যেস—তোয়ালে কাঁধে নিয়ে তিনি বাথরুমে ঢুকলেন। অমিতা তবু কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

নিচু হ'য়ে একটা বই পড়ছিলো বরুণ—অমিতার পায়ের শব্দে একবার চোখ তুলেই আবার চোখ ডোবালো। কোত্থেকে যে এত লজ্জা, এত সঙ্কোচ তাদের মধ্যে এমন একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি করলো, কে জানে! ঘরের নিস্তব্ধতা ক্রমে দু'জনকেই অত্যন্ত ব্যাকুল করলো। অবশেষে একটু কেশে বরুণ বললো, 'আপনাকে আমার শুভকামনা জানাচ্ছি।'

হঠাৎ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ গলায়, অমিতা বললো, 'আপনি আসেন না কেন?' এই প্রশ্নের জন্য বরুণ প্রস্তুত ছিলো না। অমিতার কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলো সে। মিনিট দুই তাকিয়ে রইলো তার মুখের দিকে, তারপর অত্যন্ত মৃদু গলায় বললো, 'আমার উপস্থিতির কি-কোন প্রয়োজন ছিলো?'

'আপনি জানেন না? আপনার কি হৃদয় নেই?'

বরুণ স্তব্ধ হ'লো। হৃদয় যে তার আছে, সে-কথা কী ক'রে সে তাকে জানাবে! অমিতা যদি অশরীরী হ'য়ে কোনোদিন যেতো তার মেস্-এ, তাহ'লে সে দেখতে পেতো তার হৃদয় আছে কিনা—কিন্তু সংসারটা তো হৃদয়ের ধর্ম মেনে চলে না। অমিতা কি জানে না, তার মা-বাবার কাছে বরুণের মূল্য কতটুকু! দয়ার খাদ-মেশানো এই স্নেহের একটা সাংসারিক মূল্য শত শতবার স্বীকার করে বরুণ, তা নইলে আর অবনীবাবু তাকে একটি চাকরি দেবার জন্য উৎকণ্ঠিত হবেন কেন, কিন্তু এখানে তো কোনো হৃদয়গত ব্যাপারের স্থান নেই। আর তাছাড়া এই অমিতা তো তাঁদেরই মেয়ে—আজকের দিনের এই মোহ আর ক'দিন থাকবে তার? বিবাহের পরে এই অভাজনকে নিয়েই হয়তো স্বামীর সঙ্গে হাসাহাসি করবে নিজের মূঢ়তা স্মরণ ক'রে! মনে-মনে শক্ত

হ'তে চেষ্টা করলো বরুণ। ঈষৎ হেসে বললো, 'হৃদয়টা কি কেউ দেখতে পায়? তাহ'লে তো জীবনটা অনেক সহজ হ'তো।'

'হায়রে!' অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হ'য়ে অমিতা বললো, 'মানুষের কেবলি এড়িয়ে যাওয়া, কেবলি স'রে দাঁড়ানো।' তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে। কানের জল মুছতে-মুছতে অবনীবাবু ঘরে এলেন, 'কই, একটু চা-টা দিবিনে?'

'হ্যাঁ, বাবা—' অত্যন্ত শান্ত গলায় জবাব দিয়ে অমিতা ভিতরে চ'লে গেলো।

খানিক পরেই চা এলো—খাবার এলো—পিছনে-পিছনে অমিতাও এলো। ঝড় স্তব্ধ হ'য়ে আছে তার মুখে। মুখ-চোখ ধুয়ে এসেছে, লম্বা খোলা চুলে পিঠ ঢাকা—শাড়ি বদলে একটা শাদা শাড়ি পরেছে সে। শান্ত, স্নিগ্ধ;—চোখ জুড়িয়ে গেলো বরুণের।

বেশিক্ষণ কিন্তু বসলো না বরুণ। চা খেয়েই বিদায় নিলো। একটা পার্কের মধ্যে এসে বসলো অনেকক্ষণ—তারপর অনেক রাত্রে মেস্-এ এলো। ঢাকা-দেয়া ভাতের দিকে একবার তাকালো, কিন্তু আহারে তার এতটুকুও রুচি ছিলো না—জামা ছেড়ে আলো বন্ধ ক'রে দিলো।

এর পরে কয়েকটা দিন একটানা একটা মোহের মতো কাটলো তার। সে কী করবে? কী করবার আছে তার অমিতার জন্যে? হাত পাতবে সে অবনীবাবুর কাছে? অমিতা কি তা-ই চায়? কিছুই সে বুঝে উঠতে পারলো না—বুদ্ধির অলিগলি হাৎড়ে বেড়াতে লাগলো। রাত্রি আর অপরাহ্নের সন্ধিক্ষণে রোজ তার মন উতলা হয়—একখানা সুদৃশ্য ঘর আর অতি প্রিয় একটি মুখ

যেন তাকে ক্রমাগত আকর্ষণ করতে থাকে—দিশেহারা হ'য়ে ওঠে সে। কাজ গেলো, কর্ম গেলো—অবশেষে আবার একদিন নিজের অজ্ঞাতেই তার পা এসে থামলো অবনিবাবুর দরজায়।

অমিতা মন স্থির ক'রে ফেলেছে। বিমূঢ় পুরুষের কাছে আত্ম-নিবেদনের মতো অবমাননা আর কী থাকতে পারে একটি মেয়ের জীবনে! এর চেয়ে আর স্পষ্ট ক'রে কী বলতে পারে সে? তবু যদি বরুণ মুখ ফিরিয়ে রাখে, তাহ'লে তাই থাক। একবার মনে হয়েছিলো, মা-র কাছে কেঁদে পড়বে সে—বন্ধ ক'রে দেবে এই বিয়ে, কিন্তু আত্মসম্মান—অন্তত বরুণের কাছে আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যই তাকে বিয়ে করতে হচ্ছে—আত্মসম্মানের চাইতে বড়ো আর কী আছে জগতে! মুখ-চোখের ভাব তার কঠিন হ'য়ে এলো। আর মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সুরমা দেবীর হৃদয়ও ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠলো। মেয়েই তাঁর সব, মেয়ের আনন্দই তাঁর জীবনের সফলতা।—এর চেয়েও যদি আগের বারের মতো কেঁদে-কেটে অনর্থ করতো—সানন্দে বিয়ে ফিরিয়ে দিতেন তিনি। মেঘের ভারে স্তব্ধ আকাশ—সে যে অসহ্য গুমোট, প্রাণান্তকর দম-আটকানো--তার চেয়ে বর্ষণই শতবার কাম্য। মধ্যে যে একদিন বরুণ এসেছিলো, এ-কথা জানতেন তিনি—মেয়ের এই বিষণ্ণ মুখশ্রীর সঙ্গে যে তার একটা নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে, সে-কথা বুঝতেও তাঁর বিলম্ব হ'লো না। অন্তরের মধ্যে তিনি একটা ব্যথা অনুভব করলেন, কিন্তু লাঘবের কোন উপায় দেখতে পেলেন না।

বিয়ের দিন এগিয়ে এসেছে। গরজ বেশি বরপক্ষেরই। তা নইলে এ-সব দেখে-শুনে মেয়ের মনকে সামলে নেবার জন্য সময় নিতে চেয়েছিলেন সুরমা দেবী। স্বামীকে পরামর্শ দিয়ে একটা

চিঠিও লিখিয়েছিলেন ভাবী বৈবাহিককে, কিন্তু তিনি বিয়ে পেছুতে রাজি হ'লেন না! ছেলে ব্যারিস্টর হ'য়ে এসেছে, যত তাড়াতাড়ি বসানো যায়, ততই ভালো। কিন্তু বসানো তো আর শুধু হাতে হয় না। বিয়ের দাম তো যা নেবার তা ভালো হাতেই তিনি নেবেন, কিন্তু অবনীবাবুকে টিপলে আরো অনেক রস বের করা যেতে পারে, সে-কথাও তিনি ভালো ক'রেই জানেন। আর এ-বিষয়ে সুবোধ আর তার বাবা হরিহরাত্মা।

সন্ধ্যের পর পরিচ্ছন্ন হ'য়ে বসবার ঘরে এসে বসা—এ-অভ্যেস অমিতার অনেক কালের। তাছাড়া বাড়ির অন্দরটি আজকাল একেবারে আত্মীয়কুটুম্বের ভিড়ে মুখরিত—এই একটি ঘরই যা চুপচাপ, নিরালা। তার নিজের ঘরটি পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ভিতর থেকে এ-ঘরটি একটু স্বতন্ত্র—একটা করিডরের ব্যবধান রয়েছে মাঝখানে। দরজায় মৃদু হাতের টোকা শুনেই তার বুকের মধ্যে ধ্বক ক'রে উঠলো। সে কি এতক্ষণ ধ'রে এই প্রত্যাশা নিয়েই ব'সে ছিলো? রোজই কি তা-ই থাকে? হাতের বইটির ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলো—মন বললো, যদি না হয়? রান্নাঘরের ঐ প্রান্তে ব'সে তরকারি কুটছিলেন সুরমা দেবী—দ্বিতীয় বারের টোকাটি তাঁর কানে গিয়েও পৌঁছলো—কী মনে ক'রে বঁটি কাৎ ক'রে তিনি নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন—এক মুহূর্ত ভাবলেন, তারপর বসবার ঘরের দরজা ধ'রে পর্দার ওদিকে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অমিতা দরজা খুলে দিলো। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে অল্প একটু সময় দু'জনেই চুপ ক'রে রইলো—একটু পরে বরুণ বললো, 'আসবো?'

'আপনার ইচ্ছে।'

'ব্যাঘাত করলুম ?'

'যা মনে করেন।'

দু'জনেই ঘরে এলো—অনেকখানি দূরত্ব রেখে বসলো তারা।

অমিতা বললো, 'হঠাৎ এত দয়া ?'

'দয়া বলছেন কেন? এখানে আসবার ইচ্ছে যে আমার মনে মাঝে-মাঝে কী-রকম প্রবল হ'য়ে ওঠে, তা যদি আপনি জানতেন!'

'সুখী হলুম।'

'যদিও জানি অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায়, তবু যে কেন আসি—'

'অন্যায় কেন ? কেউ কি কারো বাড়ি যায় না ?'

হঠাৎ বরুণ একটা ধাক্কা খেলো। অমিতার কাছে কি সে কেবলমাত্র কেউ? তার বেশি না? আজ একটা বোঝাপড়া করবে এমনি একটা ঝাপসা ইচ্ছা তার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিলো—সহসা সচেতন হ'য়ে কথার মোড় ফেরালো। সহাস্যে বললে, 'বিয়ে হচ্ছে কবে ?'

অমিতা সে-কথার জবাব দিলো না, বললো, 'অন্যায় কেন তা তো বললেন না ?'

'আপনার বোঝা উচিত।'

'না, আমি বুঝি না।'

'তাহ'লে তো চুকেই গেলো।'

'আপনি কি স্পষ্ট ক'রে কথা বলতে পারেন না ? সে-সাহসটুকুও আপনার নেই ?' সহসা অমিতা উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো। একটু আহত হ'য়ে বরুণ বললো, 'কী-কথা আপনি শুনতে চান ?'

'আপনি কেন আসেন এখানে? কেবলি কি চাকরি? আর কিছু না?'

বরুণ আকর্ণ লাল হ'য়ে বললো, 'আপনার কী মনে হয়?'

'চাকরি আপনার অছিলা।, আপনি যান। যান আপনি।' চাপা অথচ তীক্ষ্ণ চীৎকারে তার গলা ভেঙে এলো। বরুণ আশ্চর্য হ'য়ে হাতের উপর গাল রেখে চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলো খানিক, তারপর আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

সঙ্গে-সঙ্গে ফুঁপিয়ে উঠলো অমিতা—দু'-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদলো।

আড়ালে দাঁড়িয়ে সুরমা দেবী সবই শুনলেন। নিঃশ্বাস ছেড়ে ফিরে এলেন তাঁর তরকারি কোটার কাজে—অত্যন্ত বিমনা হ'য়ে আবার বঁটি তুলে তরকারির ঝুড়িতে হাত দিলেন।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে অবনীবাবু প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, হঠাৎ স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে চকিত হলেন—'কিছু বলছো?'

'হ্যাঁ। ঘুমুলে?'

'ভয়ানক ঘুম পেয়েছে।'

'একটা দরকারি কথা ছিলো।'

'সংক্ষেপে কিন্তু।'—অবনীবাবু একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে স্ত্রীর দিকে পাশ ফিরলেন।'

'আমাদের তো একটা মেয়ে—'একটু ভেবে সুরমা দেবী বললেন।

'সে-বিষয়ে আমারো সন্দেহ নেই।'

'তার সুখই আমাদের সুখ।'

'অবশ্য।'

'না, ফাজলেমি না।'

'কার সাধ্য তোমার সঙ্গে ফাজলেমি করে!'

'আমি বলছিলাম কী, এ-বিয়ে তুমি ফিরিয়ে দাও।'

'সে কী!—' এবার একটু অবহিত হলেন অবনীবাবু।

'তা-ই। এ-বিয়ে কালই টেলিগ্রাম ক'রে বন্ধ ক'রে দাও।'

'কেন?'

'অমির ইচ্ছে নেই।'

'ছেলেমানষি কোরো না—এবার ঘুমোও।'

কথাটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে আবার তিনি পাশ ফেরবার চেষ্টা করলেন। শক্ত ক'রে হাত ধ'রে সুরমা দেবী বললেন, 'না, আমি সত্যি বলছি—এখানে আমি ওর বিয়ে দেবো না।'

'বলছো কী তুমি? আর সাতদিন বাদে বিয়ে, মায় লেপ-তোশক পর্যন্ত কেনা-কাটা সারা—আর সেই বুড়োটা তো এর মধ্যেই আগাম দু' হাজার টাকা নিয়ে ব'সে আছে—'

'তা হোক।'

'তা হোক মানে?'—এবার অবনীবাবুর ঘুম ছুটে গেলো—উঠে ব'সে বললেন, 'তা হোক মানে কী? টাকাগুলো এভাবে নষ্ট করবার মতো অবস্থা আমার নয়।'

'বুড়োকে তো তুমি আরো তিন হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত আছো, আর তাছাড়া জামাইয়ের ব্যারিস্টারিতে বসবার মজুরিও যে তোমাকে আরো কিছু দিতে হবে না, তা আমি বিশ্বাস করি না—'

'বেশ তো! সে তো আমার জামাইকেই দিলাম—আর এ যে একেবারে গরচা যাবে।'

'গরচা যাবে কেন? জামাই আমি ঠিক করেছি। খুব ভালো জামাই। সুবোধ তার পায়েরও যোগ্য নয়!'

'সুরো, তুমি কি আমার সঙ্গে রহস্য করছো ?'

'আমি অমিতাকে বরুণের সঙ্গে বিয়ে দেবো।'

'বরুণ!' আকাশ থেকে পড়লেন অবনীবাবু, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ?'

'কথাটা কি এতই অসম্ভব ? বরুণ কি পাত্র হিসেবে সুবোধের চেয়ে অযোগ্য ?'

যোগ্য-অযোগ্যের কথাই যে ওঠে না এখানে! আজ পাঁচ মাস ধ'রে এই বিয়ে ঠিক হ'য়ে আছে—এখন এই সাতদিন আগে কথার খেলাপি করা—অসম্ভব! অসম্ভব!'

'কিছু অসম্ভব না। ক্ষতিপূরণ বাবদ তুমি যদি ধ'রে পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে দাও—নাচতে-নাচতে বুড়ো কালই আবার পাঁচ হাজার টাকা নগদের আর-একটা বিয়ে ঠিক করবে! আর ছেলেটিও তো দেখলাম, এ-সব বিষয়ে একেবারে বাপেরই সুপুত্তুর।'

চিন্তাকুল হ'য়ে অবনীবাবু বললেন, 'হঠাৎ তোমারই বা কী খেয়াল হ'লো তাও তো বুঝতে পারছিনে।'

'ওরা দু'জনে দু'জনকে ভালোবাসে।'

'তোমার মাথা!'

অবনীবাবু আবার ঘুমুবার চেষ্টা করলেন। খানিকক্ষন পরে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'যত সব উদ্ভট কথা ভাবতেও পারো! বরুণের হাব-ভাব চাল-চলন কিছুর মধ্যেই তো আমি কিছু দেখতে পেলুম না—নিজের ভাবনা নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত। আর সত্যিই যদি ওর তেমন আকর্ষণ থাকতো, তাহ'লে এখানে আর ন' মাসে ছ' মাসে আসতে হ'তো না—একদিন একবেলা না আসতে পারলেই পৃথিবী অন্ধকার দেখতো।'

গম্ভীর গলায় সুরমা দেবী বললেন, 'আমিই বারণ ক'রে দিয়েছিলাম। তাহ'লে শোনো—' আত্যোপান্ত সব কথাই তিনি স্বামীকে বললেন—আজকের ঘটনাও বাদ দিলেন না। অবনীবাবু কিছু সময় স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আগে তো বলোনি?'

'তখনো বলবার যোগ্য ছিল না।'

'এখনো না।'

'এখন নিশ্চয়ই।'

'যাও, যাও—এবার ঘুমোও।'

'ছাখো—' ঈষৎ উষ্ণ গলায় সুরমা দেবী বললেন, 'সব কথাই ও-রকম উড়িয়ে দিয়ো না—আমি যখন বলছি তখন নেহাৎই যে একটা ছেলেমানষি করছি না, এটুকু অন্তত তোমার ভাবা উচিত।'

'তা কী করতে হবে—' অবনীবাবু খিঁচিয়ে উঠলেন, 'ছেলেমানুষদের একটা সাময়িক মোহের জন্য আমরা বড়োরাও সব নির্বোধ হ'য়ে যাবো—না?'

'আচ্ছা, বড়ো হলেই সবাই ও-রকম নিষ্ঠুর হ'য়ে যায় কেন বলতে পারো? তোমার বাবারও অমত ছিলো আমাদের বিয়েতে—তুমি কি শুনেছিলে? আর শোনোনি ব'লে কি তুমি সুখী হওনি? কিন্তু তোমার বাবাও তোমাকে ঠিক এ-কথাই বলেছিলেন। এই বিচ্ছেদে যে ওরা কত কষ্ট পাবে, তা কি বুঝতে পারছো না তুমি?'

সুরমা দেবীর কণ্ঠস্বর সমবেদনায় করুণ হ'য়ে এলো।

যুক্তিতে হার মেনে অবনীবাবু বললেন, 'এ দু' দিনেই ভুলে যাবে।'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুরমা দেবী বললেন 'এটা কি একটা

কথা হ'লো! ভুলে তো মানুষ সবই যায়। পুত্রশোকও মায়েরা ভোলে—তাই ব'লেই কি সেটা শোক নয়? কেন অকারণে এত বড়ো একটা দুঃখের কারণ ঘটাবো আমরা? তুমি কি মনে করো, এ সুখ জীবনে দু'বার আসে?'

'তুমি কি জানো না বরুণের অবস্থা কত খারাপ?' গলার স্বর একটু নরম ক'রে অবনীবাবু বললেন, 'চকরির জন্য রোজ তাকে ধন্না দিতে হয় দরজায়-দরজায়—'

'ও-কথা বোলো না—' মুখে হাত চাপা দিলেন সুরমা দেবী, 'এর মধ্যেই সব ভুলে গেলে? আজই না-হয় তুমি একজন চোদ্দ শো টাকা মাইনের অফিসার হয়েছ, কিন্তু আমার বিয়ের সময় দেড়শো টাকা মাইনে ছিলো, বাপের টাকা ছিলো না, দুটি অবিবাহিত বোন ছিলো। আমি তো ভাবতে পারি না সেই পতিতুণ্ডি লেনের স্যাঁতসেঁতে একতলার ফ্ল্যাটে খুব দুঃখে ছিলাম। বরঞ্চ সেই একতলার স্মৃতিটিই আমার জীবনে সবচেয়ে মধুর। তোমার অস্তিত্বই ছিলো তখন চরম আনন্দের উৎসব—সেখানে কি টাকার প্রশ্ন ওঠে? এখন অবিশ্যি এই এলগিন রোডের দু'শো টাকার ফ্ল্যাটে অনেক শারীরিক আরামে আছি, পাঁচটা বয়-বেয়ারা আছে, গাড়ি আছে, কিন্তু সেই রোমাঞ্চ তো এর চেয়ে অনেক বড়ো জিনিশ ছিলো!'

'আহা, রোমাঞ্চ যেন চিরকালের! দৈবাৎ এই চাকরিটি না-পেলে সেই রোমাঞ্চ এতদিনে কোথায় ঠেকতো কে-জানে।'

এ-কথায় অত্যন্ত আহত হলেন সুরমা দেবী। রাগ ক'রে বললেন, 'এমন কথা বলতে পারলে তুমি?'

'অন্যায় বলেছি?' তুমি অবিশ্যি সকল মেয়েদের চাইতে একটু

স্বতন্ত্র।'—কিন্তু সে-কথায় কান না-দিয়ে সুরমা দেবী বললেন, 'মোট কথা, মেয়ের ইচ্ছেমতোই আমি তার বিয়ে দেবো।'

'পাগল!'—

'এখানে আমি কিছুতেই তোমার কথা মানবো না।'

'নিশ্চয়ই মানবে।'

'কিছুতেই না।'

অবহেলাভরে হেসে উঠে অবনীবাবু বললেন, 'আমি হাত গুটোলে সবই যে আমার মুঠোয় তা দেখছি প্রায় ভুলেই গেছো, অ্যাঁ!' তারপরে বিছানা ছেড়ে উঠে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'প্যানপ্যান ক'রে তো ঘুমটা চটালে? যত সব—'

নিঃশ্বাস ছেড়ে সুরমা দেবী বললেন, 'সে তো ঠিকই।'

সমস্ত রাত আর-একটিও কথা বললেন না সুরমা দেবী, অবনীবাবু আপন মনেই অনেকক্ষণ গজগজিয়ে শেষে ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরের দিন সকালে দু'জনেরই মুখের ভাব অতিরিক্ত গম্ভীর। কথা ছিলো, আজই মেয়েকে নিয়ে তাঁরা গয়নার দোকানে যাবেন—জামায়ের আংটি আর রিস্টওয়াচটিও সেদিনই কিনবেন। চায়ের টেবিলে ব'সে সুরমা দেবীই সে-কথা মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, 'অমিকে নিয়ে তুমিই যাও, আমি আর যাবো না।'

গম্ভীর গলায় জবাব দিলেন অবনীবাবু, 'বেশ।'

বিষণ্ণমুখে অমিতা বললো, 'আমিও যাবো না, বাবা।'

'সে হয় না, কাপড় প'রে নাও।'—আদেশ দিয়েই অবনীবাবু প্রস্তুত হ'তে গেলেন—অমিতা কথা কাটতে সাহস পেলো না।

বাড়ি থেকে বেরিয়েই অনেকটা সহজ হলেন অবনীবাবু। একটু ব্যস্ত হ'য়ে বললেন, 'আমি তো কিছুই চিনিনে—কোথায় গয়না

পাওয়া যায়, কোথায় কাপড় পাওয়া যায়—এ হ'লো তোর মা-র ডিপার্টমেণ্ট—তা তিনি তো এলেন না—তুই চিনিস তো ?'

'না।'

'তবে ?' ঈষৎ চিন্তিত হলেন অবনীবাবু। গাড়ি তখন এলগিন রোড ছাড়িয়ে প্রায় বড়ো রাস্তায় পড়েছে। অত্যন্ত ব্যগ্র গলায় অমিতা বললো, 'বাবা, চলো তবে ফিরে যাই।'

হঠাৎ অবনীবাবু ব'লে উঠলেন, 'এই, হাজরা রোড চলো।' মেয়ের দিকে ফিরে বললেন, 'বরুণকে নিয়ে বেরুই, তাহ'লেই সব সমস্যার সমাধান হবে—ও নিশ্চয়ই সব চেনে।'

'বাবা—'অত্যন্ত ব্যাকুল গলায় অমিতা বলে উঠলো, 'আমি যাবো না, আমাকে রেখে যাও।'

'তোর জিনিশ, আর তুই যাবিনে কি রে ?'

অবনীবাবু আমলেই আনলেন না ওর কথা।

অমিতার সমস্ত মুখে একটা বেদনার ছায়া ছড়িয়ে পড়লো।

ঘরময় বইপত্র ছড়িয়ে নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্তের মতো ব'সে ছিলো বরুণ—অবনীবাবুকে দেখে চমকে উঠলো।

'আপনি! আপনি এখানে ?'

'এ কী, এমন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ব'সে আছো কেন ?' দু'হাতে জিনিশ-পত্র সরিয়ে তক্তপোশের উপর একটু জায়গা ক'রে দিতে-দিতে বরুণ বললো, 'আপনাকে আমি বসতে দেবো কোথায় ?'—'আমি একটুও বসবো না—ছ'দিন পরে যার মেয়ের বিয়ে তার কি আর বসবার সময় থাকে হে ? তোমাকেও একটু খাটতে হবে।'

'আমাকে ?'

'হ্যাঁ, তোমাকেই। তুমি তো বলো আমি নাকি তোমার কত কী করেছি—তা এবার একটু ঋণশোধ করো!'

'আমি? আমি যে আজ চ'লে যাচ্ছি।' নিতান্ত নিরুপায়ভাবে বরুণ উচ্চারণ করলো কথাটা।

অবাক হ'য়ে অবনীবাবু বললেন, 'সে কী? কোথায় যাবে?'

'তা ভাবিনি।'

'ও, ভাবনি—তাহ'লে এখন একটু আমার সঙ্গেই চলো।'

'আপনার সঙ্গে? কোথায়?'

'কোথায় যে যাবো তা আমিও জানি না—বিয়ের জিনিশ কিনতে যাচ্ছি, এ পর্যন্তই জানি।'

বিয়ের কথায় বরুণ চকিত হ'লো; একসঙ্গে কত কথা যে ব'য়ে গেলো তার বুকের মধ্যে। চুপ ক'রে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো একটু, তারপর বললো, 'আমার যে কিছুই গোছানো হয়নি, মাস্টার মশাই।'

'ও হ'য়ে যাবে, চলো, চলো। তুমি না-গেলে একা-একা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

অবনীবাবু বরুণের পিঠের উপর হাত রাখলেন। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে বরুণ নিজের হৃদয়াবেগকে দমন ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'চলুন।'

এই ভদ্রলোকের কাছে সে কত রকমে কৃতজ্ঞ, অথচ আজ তাঁর কন্যার বিয়েতে সে কিছুমাত্র সাহায্য করবে না, এটা তার পক্ষে কি নিতান্ত অন্যায় নয়? নিজের মনকে শক্ত ক'রে বরুণ প্রস্তুত হ'লো। পিছন ফিরে জামা গায়ে দিতে-দিতে বারেবারেই মুখ মুছতে লাগলো রুমালে।

কিন্তু গাড়ির ভিতরে যে আরো একটি গভীর দুঃখ তার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আছে এটা সে জানতো না। অমিতাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো বরুণ। এ'কি তবে অমিতারই কারসাজি? তার দুর্বল জায়গায় আঘাত দেবার জন্যই কি এই আমন্ত্রণ? আনন্দ ক'রে বেরিয়েছে বিয়ের জিনিশ কিনতে, সেটা দেখানোই কি অমিতার আসল উদ্দেশ্য? নিজের অজ্ঞাতেই তার মুখ দিয়ে একটি নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। অবনীবাবু বললেন, 'ভাবছো কী, উঠে পড়ো—এই ফিরতে-ফিরতে দেখবে বেলা বারোটা!'

'আমি—'

'আর কথা না, ওঠো।'

উঠতে হ'লো বরুণকে—যথাসম্ভব সংকুচিত হ'য়ে সে অমিতার পাশে ব'সে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

যেতে-যেতে অবনীবাবু বললেন, 'আর বলো কেন, একখানা বিয়ের ব্যাপার কি সোজা? তোমরা সবাই মিলে সাহায্য না-করলে তো আমার উপায়ই নেই। বিয়ের ক'দিন কিন্তু তোমাকে ছাড়ছিনে!'

'আমাকে তো যেতেই হবে।'—এক নিঃশ্বাসে বরুণ বললো।

'কী এমন দরকার তোমার? বিয়ের ক'টা দিন না-হয় থেকেই যাও।'

বরুণ দু'বার কাশলো, কিন্তু জবাব দিতে পারলো না।

'বুড়ো হ'য়ে গেলাম, দু'দিন পরে শ্বশুর হচ্ছি।' অবনীবাবু হাসলেন।

অমিতা অসহিষ্ণু গলায় ব'লে উঠলো, 'বাবা, আমার মাথা

ধরেছে, আমার অত্যন্ত শরীর খারাপ হচ্ছে—আমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাও।'

'দাঁড়া, দাঁড়া—সব সারবে।'—বরুণের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'সুবোধের সঙ্গে বুঝি তোমার আলাপ হয়নি?'

'না।'

'বেশ ছেলে! বুদ্ধিসুদ্ধি আছে, 'কী বলিস?'—অবনীবাবু মেয়ের দিকে তাকালেন।

অমিতা জবাব দিলো না। পুরো বেগে গাড়ি ছুটলো। পাশাপাশি ব'সে দুটি প্রাণী পরস্পরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিরাম সচেতন হ'য়ে রইলো, আর অবনীবাবু একাই কথা ব'লে-ব'লে ওদের চকিত করতে লাগলেন।

সর্বপ্রথম অবনীবাবু ঘড়ির দোকানে থামলেন। বরুণ বললো, 'আমি ঘড়ি-টড়ি চিনিনে।'

'চেনবার দরকার কী হে, পছন্দ তো আছে। এসো, এসো—'

'আমার পছন্দের সঙ্গে কি—' বরুণ আমতা-আমতা করতে লাগলো—একবার আড়চোখে অমিতাকেও দেখে নিলো।

'কী মুশকিল! তোমরা আজকাল এত বেশি বিনীত হয়েছো!'

অমিতা বললো, 'আমি গাড়িতে থাকি, বাবা।'

'তোরা আরম্ভ করলি কী, বল তো?' অবনীবাবু হাত ধ'রে মেয়েকে গাড়ি থেকে নামিয়ে বললেন, 'হয়েছে কী? শরীর ভালো নেই?'

'না।'

'তাহ'লে চল, এই ঘড়ি আর আংটি কিনেই ফিরে যাই—জোরটা না-হয় বিকেলে এসে কিনবো।'

যদিও মাত্র দুটোই জিনিশ, তবু পছন্দ করতে কম সময় গেলো না।

অবনীবাবু ক্রমাগত এটা-ওটা দেখতে লাগলেন,—বললেন, 'কী হে পছন্দ হয়?'

বরুণ বললো, 'বেশ তো।'

'আমার কিন্তু তেমন ভালো লাগছে না।'

'হ্যাঁ, তেমন—'

'আরে, ঠিক ক'রে বলো কেমন লাগছে! আমর কথা শুনে বোলো না।'

লজ্জিত হ'য়ে বরুণ তাড়াতাড়ি একটু নাড়াচাড়া করলো ঘড়িগুলোকে—একটা পছন্দও করলো—অবশেষে অসম্ভব দামে কেনা হ'লো সেটা। অমিতা সারা সময় পিছন ফিরেই দাঁড়িয়ে রইলো, একটা কথাও বললো না।

তারপর আংটি—অবনীবাবু বললেন, 'পুরুষের জিনিশ যত সিম্পল হয় ততই ভালো, কী বলো?'

বরুণ বললো, 'তা তো ঠিকই।'

'আর হীরেটা ছোটো হওয়াই ভালো।'

'হ্যাঁ।'

'অনেকে আবার ঠিক এই ধরনের অনেকগুলো হীরে দিয়ে একটা ফুলও পছন্দ করে।'

'তা করে।'

হঠাৎ অবনীবাবু ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'কোনটা ঠিক হে? তুমি যে সবটাতেই হ্যাঁ বলছো?'

অপ্রস্তুত হ'য়ে বরুণ মাথা নিচু করলো। শেষ পর্যন্ত বোঝা

গেলো, হীরে-সেট-করা ফুলটাই বরুণের পছন্দ। দাম যদিও অত্যন্ত বেশি, তবু অবনীবাবু সেটাই কিনলেন। পকেট হাৎড়ে জামায়ের আঙুলের মাপটা খুঁজলেন—কিন্তু দেখা গেলো, সেটি তিনি ভুলে ফেলে এসেছেন। নিরুপায় হ'য়ে একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন,—'তোমার মাপে নিলেই হবে হয়তো, দেখি আঙুল ?'

সসংকোচে হাত পকেটে ঢুকিয়ে বললো, 'না না, সে কি হয় ?'

'হবে না কেন, সুবোধের আঙুল ঠিক তোমার মতোই মোটা-মোটা—দেখি।'

বরুণের আঙুল টেনে নিয়ে তিনি ঢোকালেন আংটিটা, ফর্শা সুগঠিত আঙুলটি অলঙ্কৃত হ'য়ে সত্যি বড় সুন্দর দেখালো। নিজের আঙুলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে উঠলো বরুণের—মুহূর্তে টেনে খুলে ফেললো আংটিটা।

অবনীবাবু গাড়িতে আসতে-আসতে বললেন, 'চমৎকার মানিয়েছিলো কিন্তু তোমার হাতে !'

ব্যথিত গলায় অমিতা বললো, 'বাবা, আরো যদি তোমার কিছু কেনবার থাকে, ওঁকে আর অনর্থক আটকে রেখো না।'

'নাঃ, এই কিনতেই এত সময় গেলো, এবার আর বাড়ি না-গেলেই চলছে না—আর সব তোর মা-ই কিনবেন কাল।'

মাথা নিচু ক'রে ব'সে বরুণ ভাবলো, বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার পরিয়ে তো দেখা হয়েছে—তাই আর অমিতার সাধ নেই তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে। অমিতার স্বামীর জিনিশ বরুণ কিনে দেবে—এটা বরুণের পক্ষে সুখের কাজ নয়—নিজের অন্তরতম ধনটি যে লুণ্ঠন করলো তাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করা কি এতই সহজ ? তবু তাই আজ করতে হ'লো বরুণকে, কিন্তু তবু তো অমিতাকে

এতক্ষণ ধ'রে সে দেখলো ?—এত কাছে ব'সে রইলো ! এরই কি কম মূল্য—অমিতার এই সান্নিধ্যের বিনিময়ে এই গভীর দুঃখও তার কাছে কি এতক্ষণ সহনীয় হ'য়ে ছিলো না ? ভাবতে-ভাবতে সে অত্যন্ত অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলো, এক সময় হঠাৎ গাড়ি থামলো—চমকে তাকিয়ে দেখলো, অবনীবাবু নামছেন গাড়ি থেকে, বললেন, 'একটু বোসো, আমি এই এক্ষুনি আসছি।' দ্রুতপায়ে তিনি ফুটপাতে উঠে একটা দোকানে গিয়ে ঢুকলেন, সঙ্গে-সঙ্গে ড্রাইভারও নেমে পায়চারি করতে লাগলো ফুটপাতে, আর সীটের দুই কোণে দুটি মানুষ নিতান্ত অচেনার মতো নিঃশব্দে রাস্তার দুই দিকে তাকিয়ে রইলো। এক সময় বরুণ অনুভব করলো, অমিতা একটু চঞ্চল হয়েছে, মুখ ফেরাতেই চোখাচোখি হ'লো দু'জনের—মুহূর্তকাল দৃষ্টি মিলিত হ'য়ে রইলো তারপর ভাঙা-ভাঙা গলায় অত্যন্ত মৃদু স্বরে অমিতা বললো, 'আমাকে ক্ষমা করুন।'

ততোধিক মৃদু গলায় বরুণ বললো, 'আপনি তো কিছু করেননি!'

'আমি কাল আপনার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করিনি।' প্রায় কান্নার মতো শোনালো অমিতার কণ্ঠস্বর।

বরুণ নিঃশ্বাস নিয়ে বললো, 'ঐ আমার প্রাপ্য ছিলো। ও তো মিথ্যা কথা নয়।'

'মিথ্যা কথা নয়!'

'না।'

'তাহ'লে সত্যিই আপনি কেবল চাকরির জন্যই আমার বাবার কাছে যেতেন না ?'

'দেখুন—' জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নিয়ে বরুণ বললো, 'আপনার

সঙ্গে হয়তো আজই আমার শেষ দেখা, কাজেই সত্যি কথাটাই বলতে কোনো বাধা নেই। ওখানে আমি আপনার জন্যেই যেতুম, অনেক চেষ্টা ক'রেও নিজেকে সংযত করতে পারতুম না,—আর সে-কথা তো আপনার না-জানবার কথা নয়!'

মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অমিতা বললো, 'সত্যি?'

'সত্যি।'

'তবে কেন আগে বলেননি এ-কথা? কেন আমাকে এই সংশয়ে এত কষ্ট দিলেন?'—দু'হাতে মুখ ঢেকে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কেঁদে ফেললো অমিতা।

এতখানি উচ্ছ্বাসের জন্য প্রস্তুত ছিলো না বরুণ। অমিতার কান্না দেখে অত্যন্ত ব্যাকুল বোধ করলো সে। কাছে এগিয়ে বললে, 'ছি, ছি, এ কী পাগলামি—এক্ষুনি মাস্টারমশাই এসে পড়বেন যে!'

অমিতার আঙুলের ফাঁক দিয়ে টপ্ টপ্ ক'রে জল বেয়ে পড়তে লাগলো, মনে হ'লো এ-কান্না সহজে থামবার নয়। কী যে করবে ভেবে পেলে না বরুণ। বুকটা ভারি হ'য়ে উঠলো, সুখে আর বেদনায় মেশা এক অপূর্ব অনুভূতিতে যেন মুহ্যমান হ'য়ে গেলো। এক সময়ে হাত সরিয়ে আনলো সে, তারপর পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে চোখ মুছিয়ে দিতে-দিতে বললো, 'ছেলেমানুষ নাকি?'

হঠাৎ বজ্রপতন হ'লো—গাড়িতে ঢুকতে-ঢুকতে অবনীবাবু বললেন, 'কী হ'লো, চোখে কিছু পড়লো নাকি?'

অসম্ভব চমকে স'রে এলো বরুণ, লজ্জায় প্রায় ম'রে গিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, এই কী যেন।'

অবনীবাবু আর-কিছু বললেন না, গম্ভীর হ'য়ে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এলগিন রোডে মোড় নেবার আগে ভয়ে-ভয়ে বরুণ বললো, 'আমি এখানেই নামি।'

'না, তোমার সঙ্গে দরকার আছে।' অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত জবাব।

বরুণ আর সাহস পেলো না কিছু বলতে। কী দরকার সে জানে। কী বলবেন তিনি? নিজের মনকে অভয় দিতে লাগলো সে। মনে-মনে ভাবলো, উনি যাই বলুন—সেও আর সত্যি কথা গোপন করবে না। অমিতার মনই যদি জানা গেলো, তবে আর ভয় কাকে? কিন্তু তবু ভিতরে-ভিতরে কেমন কাতর হ'য়ে পড়লো সে। চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত ভয় করতে লাগলো।

বাড়ি এসে অবনীবাবু বাইরের ঘরে বরুণকে বসিয়ে রেখে ভিতরে গেলেন, অমিতাও সঙ্গে-সঙ্গে অদৃশ্য হ'লো। বরুণের মনের অবস্থা শোচনীয়। এখনই আবার সুরমা দেবীর মুখোমুখি হ'তে হবে—তাঁর উপদেশ সে কি ভুলে গেছে? বিন্দু-বিন্দু ঘামে তার কপাল ভিজে যেতে লাগলো।

পরদা ঠেলে সুরমা দেবী ঢুকলেন, খুব হাসিখুশি মুখের ভাব, সস্নেহে বললেন, 'ভালো আছো?'

বুক ঢিপ ঢিপ করছিলো বরুণের—একটা সাংঘাতিক অবস্থার জন্যই সে প্রস্তুত হচ্ছিলো মনে-মনে। প্রশ্ন শুনে আর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু আশ্বস্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'ভালোই। আপনি ভালো আছেন?'

'এই তো এক রকম। বোসো, ঈশ, ঘেমে গেছো যে—ওঁর

কাণ্ড, সারা শহর ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন বোধ হয়! জিনিশগুলো তোমার পছন্দ হ'লো তো?'

বরুণ মাথা কাৎ করলো।

সুরমা দেবী সুইচবোর্ডের কাছে এগিয়ে গিয়ে পাখাটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'বোসো, একটু বিশ্রাম ক'রে তারপর স্নান ক'রে খাও।'

এবার ঘোর আপত্তি করলো বরুণ, 'না, না, অসম্ভব, আমার অত্যন্ত দরকার আছে মেসে।'

'হ্যাঁ, এই রোদ্দুরে তোমাকে আবার ছেড়ে দিই আর কি!'

তাকে আর কথাই বলতে দিলেন না তিনি—চ'লে যেতে-যেতে বললেন, 'বোসো, অমিতাকে পাঠিয়ে দি।'

এর পরেই চটির শব্দ করতে-করতে অবনীবাবু ঢুকলেন, স্ত্রীকে চ'লে যেতে দেখে বললেন, 'যাচ্ছো কেন, বিয়ের চিঠিটা এবার লিখে ফেলা যাক।'

ফিরে এসে এইটুকু সময়ের মধ্যেই তিনি কী ক'রে স্ত্রীকে এত খুশি করেছেন কে জানে, সকালবেলাকার মেঘের চিহ্নমাত্র নেই তাঁর মুখে। একগাল হেসে বললেন, 'ও-সব তোমরাই করো।'

'না, না, তা কি হয়?'

অবনীবাবু বরুণের পাশে এসে বসলেন—খুব গম্ভীরভাবে বললেন, 'বলো দেখি তোমার বাবার নাম, আর তোমার দেশ।'

কথার তাৎপর্য বুঝতে পারলো না বরুণ। বড়ো-বড়ো চোখ তুলে আশ্চর্য হ'য়ে তাকিয়ে রইলো অবনীবাবুর মুখের দিকে।

সুরমা দেবী বললেন, 'তোমার এমন একটা হন্তদন্ত ভাব যে মানুষকে একেবারে হকচকিয়ে দাও।'

'বা রে, নেমতন্ন-চিঠি ছাপতে হবে না ?' বললেন, অবনীবাবু।

বরুণের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত স্নেহভরে সুরমা দেবী বললেন, 'সময় সত্যিই সংকীর্ণ। তোমার যদি অসুবিধে না হয়, তাহ'লে এই সামনের বুধবারেই আমি তোমাদের বিয়ে দিতে চাই।'

'আমাদের !'—হঠাৎ যেন হাঁ হ'য়ে গেলো বরুণের মুখটা। বিস্ময়ের একেবারে শেষপ্রান্তে পৌঁছলো সে, সঙ্গে-সঙ্গে তার হৃৎপিণ্ডটাও থেমে গেলো—এক সময়ে সচেতন হয়ে ঢোঁক গিলে বললো, 'আমি কি আপনার ঠাট্টার যোগ্য ?'

'ঠাট্টা ?' অবনীবাবু বলে ফেললেন, 'ঠাট্টা কী হে ? জামায়ের সঙ্গে আবার ঠাট্টা হয় নাকি ?'

অমিতা ঘরে এলো। সুরমা দেবী একবার তাকালেন মেয়ের দিকে, তারপর বরুণকে বললেন, 'ওর ইচ্ছেই আমাদের ইচ্ছে, আর ওর ইচ্ছে তো নিশ্চয়ই তুমি। কাজেই এ-বিয়ে শেষ পর্যন্ত ফিরিয়েই দিলুম, কিন্তু এদিকে আমাদের তো সবই প্রস্তুত, এমনকি লাহোর থেকে আমার বড়ো ননদটি পর্যন্ত এসে পৌঁছেছেন—কাজেই তারিখটা আর বদলাবার ইচ্ছে নেই আমার। কী বলো ?'

বরুণ বলবে কী ? সে কি স্বপ্ন দেখছে ? তার কি মাথা-খারাপ হ'য়ে গেলো ? অত্যন্ত বিহ্বল হ'য়ে পড়লো সে। বিস্ময়ের বিমূঢ়তা কাটিয়ে কোনো জবাবই দিতে পারলো না। হয়তো তাকে একটু সামলাবার সময় দেবার জন্যই অবনীবাবু আর তাঁর স্ত্রী বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

ঘরে একটা অতল নীরবতা নামলো। কাটলো খানিকক্ষণ চুপচাপ, এক সময় দ্বিধা কাটিয়ে দু'জনেই চোখ তুললো।

মৃদু গলায় বরুণ বললো, 'ভাগ্যকে কি বিশ্বাস করতে পারি ?'

অমিতা কথা বলতে পারলো না—তার গালের কাছটা লাল হ'য়ে উঠলো।—বরুণ কাছে এগিয়ে এসে আস্তে তার কাঁধে হাত রেখে বললো, 'কথা বলছো না?'

বরুণের হাতের পাতায় নিজের মুখ ঢেকে ফেললো অমিতা—অস্পষ্ট গলায় বললো, 'কী আশ্চর্য!'

সুমিত্রার অপমৃত্যু

হঠাৎ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে একটা আর্তনাদ উঠলো—খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম পাশের বাড়ির সব ক'টি আলো জ্বলছে—লোকজন যেন বড়োই ব্যাকুল। লাফ দিয়ে উঠলাম, ত্রস্তে কাপড় ঠিক করতে-করতে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। শুনলাম শ্রীপতিবাবুর পাগল মেয়েটি গভীর রাত্রে বিছানা থেকে উঠে ছাতে গিয়েছিল, তারপর সেই তেতলা ছাত থেকে লাফ দিয়ে পড়েছে।

হতভাগিনীর এতদিনের চেষ্টা সফল হ'লো! নিশ্বাস ছেড়ে ঘরে এলাম, চোখের কোণ বেয়ে দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। এই পাগলিনীকে আমি মনে-মনে ভালোবাসতাম। আমার পঁয়ত্রিশ বছরের অবিবাহিত জীবনকে এই পাগলিনীই আবিষ্ট ক'রে রেখেছিল। আলো নিবিয়ে, দরজায় তালাচাবি বন্ধ ক'রে কোমরে গামছা বেঁধে বেরিয়ে গেলাম।

আমি আজ চার বছর শ্রীপতিবাবুর প্রতিবেশী। প্রথম যেদিন এ-বাড়িটি ভাড়া নিতে আসি—দেখেছিলাম জানালার শিক ধ'রে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। তার ছবির মতো ভঙ্গি ও নিটোল নিখুঁত চেহারায় আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম—বলাই বাহুল্য, আর দ্বিরুক্তি না-ক'রে অতি তাড়াতাড়ি মুখোমুখি এ-বাড়িটি আমি ভাড়া নিলাম। কিন্তু কয়েকদিন পরেই বুঝতে পারলাম, মেয়েটি পাগল। আমার জানালা খোলা থাকলে স্পষ্টই ওর ঘর দেখতে পাওয়া যেতো। ঐ ঘরটি ছেড়ে সে বড়ো একটা নড়তো না, আর বেশির ভাগ সময়ই ছোট্ট লোহার খাটটিতে শুয়ে থাকতো। মাঝে-মাঝে দেখতে

পেতাম, বিছানার তলা থেকে রাশি-রাশি কাগজ বার ক'রে অত্যন্ত মন দিয়ে পড়ছে। ওর ঐ ছিল বাতিক—সেই কাগজগুলোই ছিল ওর প্রাণ। বিছানার আশেপাশে ও কাউকে ঘেঁষতে দিতো না; একমাত্র ওর মা ছিলেন ওর পরম বিশ্বস্ত বন্ধু—তিনিই ওর বিছানা ঝেড়ে দিতেন। অত্যন্ত রুগ্ন ও দুঃখী চেহারার মানুষ ছিলেন তিনি। শুনেছিলাম প্রায় দশ বছর যাবত হার্টের অসুখে ভুগছেন!

শ্রীপতিবাবুর সঙ্গে আলাপ হ'তে আমার দেরি হয়নি—কিন্তু পাগল সন্তান আর রুগ্ন স্ত্রীই তাঁর মন-প্রাণের সমস্ত রস নিঃশেষ ক'রে দিয়েছিলো, কাজেই তাঁর হৃদয়ে কোনো আনন্দ বা আশা ছিলো না—তাঁর কাছে গেলেই মনটা যেন আপনা থেকেই উদাস হ'য়ে উঠতো—যেন কোনো গোরস্থান বা শ্মশানে এসেছি।

মেয়েটির নাম ছিল সুমিত্রা। ওর মা বাবা সবাই মিতু ব'লে ডাকতেন। একমাত্র সন্তান, নিশ্চয়ই পরম যত্নের ধন। কিন্তু বাপকেও কাছে ঘেঁষতে দিত না—বিশেষত বিছানার কাছে এলে এমন সাংঘাতিক চীৎকার করতো যে ভদ্রলোক বিহ্বল হ'য়ে পড়তেন। দুই চোখ বেয়ে তাঁর দরদর ধারে জল গড়িয়ে পড়তো। ঐ বিছানাটির মধ্যেই ওর যত আকর্ষণ লুকোনো ছিলো বলে ঘর ছেড়ে এক পা নড়তো না, বেশির ভাগ সময় শুয়েই থাকতো। মা-ও শয্যাশায়ী, কাজেই পরিচর্যার ভার ছিলো একটি পরিচারিকার উপর। ঘরের ঐ কোণে—খাট থেকে সবচেয়ে দূরের কোণটিতে এসে সে খাবার রেখে যেতো—স্নান করবার জল, প্রয়োজনীয় টুকিটাকি সমস্ত, তারপর ও-ঘর থেকে ধ'রে নিয়ে আসতো রুগ্ন মাকে; তিনি একটি জলচৌকির উপর ব'সে-ব'সে সব ক'রে দিতেন। মেয়েটির কথা বলবার একেবারেই অভ্যেস ছিলো না—

চুপচাপ গম্ভীর ও বিষন্ন মূর্তি নিয়ে যখন সে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াতো তখন তাকে অত্যন্ত চিন্তামগ্ন দেখাতো। হঠাৎ কোনোদিন দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠতেও দেখেছি।

ওর প্রতিটি ভঙ্গি প্রতিটি কাজই আমার মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছিল্স। মাঝে-মাঝে মনটা ব্যথায় ভ'রে উঠতো—মনে হ'তো শ্রীপতিবাবু যথেষ্ট চিকিৎসা করছেন না, কোনো-কোনো সময় এ-কথাও কল্পনা করেছি যে আমি যদি ওকে বিবাহ করি তাহ'লে বোধ হয় ও সেরে যায়—দু' একবার এ-প্রস্তাব করবার জন্য বদ্ধপরিকরও যে না হয়েছি তা নয়, কিন্তু শ্রীপতিবাবুর কাছে গেলে আর মনে সে-ভাব রাখতে পারিনি।

আজ যখন আমার সমস্ত চিন্তার অবসান ঘটলো—একটা গভীর নিশ্বাসে সমস্ত প্রাণমন আমার মথিত হ'লো। শ্রীপতিবাবু আমাকে দেখেই মুখ নিচু করলেন, উদ্গত কান্নাকে যথাসম্ভব চেপে বললেন, 'চলুন, অভাগিনীকে একবার শেষ দেখা দেখে নিন্।' শ্রীপতিবাবুর সঙ্গে দোতলায় উঠে গেলাম। সেই ঘরে সেই খাটটিতে একখানা চাদর গায়ে শুয়ে আছে—মৃত মানুষ না, যেন গভীর শান্তিতে আচ্ছন্ন একটি ঘুমন্ত মানুষ। অত উঁচু থেকে প'ড়ে গিয়েও কোনো বিকৃতি হয়নি, কেবল নাকের দুপাশে দু'টি রক্তের রেখা কান পর্যন্ত গিয়ে চুলের মধ্যে মিশেছে। বালিশের উপর দিয়ে খোলা চুল ছড়িয়ে ছাড়য়ে প্রায় মাটিতে নেমেছে—হাত দু'টি জোড় ক'রে বুকের উপর রাখা। মেঝের উপর সংজ্ঞা-হীন রুগ্ন মা। আমি গিয়ে ওর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়ালাম, নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলাম ঐ পূর্ণিমার চাঁদের মতো পরিপূর্ণ সুন্দর মৃত মুখখানার দিকে—তারপর আস্তে ওর ঠাণ্ডা কপালটির উপর নিজের হাতটি ছোঁয়ালাম।

আস্তে-আস্তে রাত বাড়লো, প্রায় ভোর চারটার সময় বার করা হ'লো মৃতদেহ। বাড়িটি লোকে লোকে ভ'রে গিয়েছিল—শ্রীপতিবাবু বললেন, 'আপনার উপর রইল আমার স্ত্রীর ভার—শ্মশান থেকে ফিরে এসে যেন দেখতে পাই।' ব'লেই তিনি এবার বুকফাটা আর্তনাদে কেঁপে উঠলেন। আমি সস্নেহে ভদ্রলোকের পিঠের উপর হাত বুলিয়ে বললাম, 'সমস্তই নিয়তি—কিচ্ছু ভাববেন না ওঁর জন্যে—উনি আমার মা।' ভদ্রলোক আবেগে একবার আমার হাত চেপে ধরলেন। উঠোন মুখরিত হ'য়ে উঠলো হরিধ্বনিতে।

ভদ্রমহিলাকে আমি পরিচারিকাটির সাহায্যে ধরাধরি ক'রে অন্য ঘরে নিয়ে এলাম। মাথায় জলের ঝাপটা দিলাম—পরিচারিকাটি শিয়রে ব'সে হাওয়া করতে লাগলো। আমি কিছুক্ষণ ব'সে ফিরে এলাম ঐ ঘরটিতে। খাট থেকে বিছানাশুদ্ধ ওকে তুলে নিয়ে গেছে—ঘরটি শূন্য—হাওয়ায়-হাওয়ায় দীর্ঘশ্বাস। ঘরময় রাশি-রাশি কাগজ উড়ছে—হঠাৎ মনে হ'লো এই তো ছিলো ওর পরম সম্পদ, খানিকটা অন্যমনস্ক হ'য়েও খানিকটা কৌতূহলবশতঃ নিচু হ'য়ে একটা কাগজ কুড়িয়ে নিলাম—কাগজটির উপর হাতে আঁকা একটি পরম সুন্দর মানুষের মুখ, তলায় লেখা 'তুমি'—আরো দু'একটা কাগজ তুললাম—মুক্তাবিন্দুর মতো পরিচ্ছন্ন সুন্দর হাতের লেখার কাগজগুলো পরিপূর্ণ। পৃষ্ঠার নম্বর দেয়া আছে—সাগ্রহে সমস্ত কাগজ সংগ্রহ ক'রে আমি তার মধ্যে চোখ ডোবালাম। মুহূর্তে আমার মন নিবিষ্ট হ'য়ে উঠলো।

তাকে প্রথম দেখলুম সতীদির বিয়েতে। বরের বন্ধু। গেটে ফুলের মালা নিয়ে অভ্যর্থনার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলুম। সতীদির বাবা

আমার মেশোমশায়—ভারি শৌখিন, বললেন—সবচেয়ে সুন্দর মেয়ে কে? সে করবে বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা। সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ স্থান ঐ পরিবারে আমারই ছিল—তারপরেই মালতীদি (মেশোমশায়ের ছোটো মেয়ে)। আমরা দু'জনে দেবদারু পাতায় সাজানো গেটের দু'-পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম বেলফুলের মালা নিয়ে—আচমকা চোখ পড়লো তার মুখের উপর—ক্ষণিকের জন্যে থেমে রইলো হাত আর চোখ—দেখলুম তার ছ'ফুট লম্বা নিটোল শরীর, বাঙালির তুলনায় অস্বাভাবিক ফর্শা রং, অপরূপ মুখাবয়ব। লম্বা হাতটি বাড়িয়ে মৃদু হেসে বললো, 'আমাকে বুঝি মালা দেবেন না?' ওঁর সেই হাসিতে উজ্জ্বল চোখ আমাকে লজ্জা দিল, ত্রস্তে মালাটি হাতে তুলে দিয়ে মুখ ফেরালুম। সেই রাত্রিতেই বিয়ের আসরে ওর সঙ্গে আমার আবার চোখাচোখি হ'লো—ভালো ক'রে আমার বিয়েই দেখা হ'লো না। রাত্রিতে শুতে গেলাম দুটোর সময়—ঘুম এলো না। ঐ মৃদুমধুর হাসিভরা মুখখানা ভেসে রইলো চোখের উপর।

পরদিন সকালবেলা একদল আত্মীয়ের সঙ্গে সে-ও এলো বাসি বিয়ে দেখতে—(না কি আমাকে দেখতে?) আমাদের নতুন বর সুধীনবাবু তাকে চেঁচিয়ে কাছে ডাকলেন—নাম শুনলাম সত্যেন। বলাই বাহুল্য, আমার মেশোমশায় দুপুর পর্যন্ত সবাইকে আটকে রাখলেন, কাউকেই না-খেয়ে যেতে দিলেন না। আমার সঙ্গে ওর আলাপ হ'লো। সুধীনবাবু বললেন, বুঝতেই পারছো সত্যেন, স্ত্রীর সঙ্গে-সঙ্গে এমন একটি শ্যালিকাকে ফাউ পাওয়া কী সাংঘাতিক একটা ভাগ্যের ব্যাপার! সেই কথা আছে না—নন্দকুলচন্দ্রবিনা বৃন্দাবন অন্ধকার—আমারও এখন সেই দশা—ঐ শ্যালিকামুখ-

"চন্দ্রবিনা শ্বশ্রুকুল অন্ধকার—' আমি সুধীনবাবুর দিকে কটাক্ষ করলুম। ও আমার মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে হেসে বললো, 'ভাগ্যবানের ভাগ্যেই শিকে ছেঁড়ে। তবু তো ভাগ্যকে অনেক ধন্যবাদ যে তুমি আমার বন্ধু আর তোমার ভাগ্যের ছিটেফোঁটায় আমার চোখও আপ্যায়িত হ'লো।'

এই হ'লো ভূমিকা। মানুষের ভালোবাসা আকর্ষণ করবার প্রধান উপকরণই হচ্ছে মানুষের চেহারা, তার উপর যদি তার চরিত্রও অনুকূল থাকে তাহ'লে হয় সোনায় সোহাগা, উপরন্তু যদি সে লোক ধনী হয় তাহ'লে আর উচ্চবাচ্য করবারই কেউ থাকে না। সত্যেন এ-বাড়িতে অবারিত দ্বার পেলো। আমার মা মাত্রই এক সন্তানের জননী এবং সেটি আমি, অতএব তাঁর রুদ্ধ পুত্রস্নেহের ধারা সত্যেনকে অবিরল ধারায় সিক্ত করলো। বাবা এ-সব যুবক-টুবক একেবারেই পছন্দ করতেন না, আর আমার কোন ভাই না থাকায় কোনো যুবকের সমাগমও ছিলো না, কিন্তু সত্যেনের বেলায় বাবা তাঁর গতানুগতিক মতিগতি একটু পরিবর্তন করলেন। স্বীকার না করলেও বুঝতে পারলাম, সত্যেনের প্রতি তাঁর যথেষ্ট পক্ষপাত আছে। শুনলাম ওর বাবা লাহোরবাসী, সেখানে তাঁর যথেষ্ট সম্মান প্রতিপত্তি। বিলেত থেকে বছরখানেক হ'লো ঘুরে এসেছে, এখানে ব্যবসা করে।

সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে আমার সঙ্গেই ওর দেখাশোনা হ'তো সবচেয়ে কম। ঠিক আজকালকার প্রথায় আমি মানুষ হইনি, কতকগুলি অহেতুক লজ্জায় মন সর্বদাই আচ্ছন্ন ছিল। পুরুষমানুষ যে পুরুষমানুষই, এ-বিষয়ে এতই সচেতন ছিলাম যে সত্যেন এলেই মাকে ডেকে দিয়ে অন্য ঘরে গিয়ে হাঁফ ছাড়তাম। নিঃশব্দে

হয়তো দু'টো পান দিয়ে গেলাম কিম্বা চা। সত্যেনও লাজুক ছিল ব'লে মুখোমুখি আলাপ আমাদের হ'তোই না। অথচ আমি জানতাম সত্যেন এখানে আমার জন্যই আসে, আমার অস্তিত্বেই সত্যেনেরই পরম আনন্দ। আমি যে এই বাড়িতেই আছি সেজন্যেই এ-বাড়ির প্রতিটি অণু-পরমাণুও ওর কাছে প্রিয় হ'য়ে উঠেছিলো।'

বাবা খুব সেকেলে মানুষ। যাকে বলে একেবারে গোঁড়া হিন্দু। তিনি পরলোক মানতেন, দেবদ্বিজে তাঁর অগাধ ভক্তি। বিজাতীয় ছোঁয়াচ বাঁচাবার চেষ্টায় অস্থির থাকতেন। মা সে-সব পছন্দ করতেন না, এই নিয়ে তাঁদের প্রায়ই মতবিরোধ হ'তো। আমাকে ইস্কুলে পড়তে না দেবার কারণও অনেকটা এই যে নানা-রকম ম্লেচ্ছাভাবাপন্ন আজকালকার অসভ্য মেয়েদের সঙ্গে মিশে পাছে বিগড়ে যাই। মার শত ইচ্ছায়ও ফল হ'লো না, অবশেষে বাড়িতেই এক বৃদ্ধ মাস্টারের উপর আমার বিদ্যাশিক্ষার ভার ন্যস্ত ক'রে নিশ্চিন্ত হ'লেন। অতখানি বয়সেও আমি কোনোদিন থিয়েটার বা সিনেমা দেখিনি। কাজেই বাড়ি থেকে বেরুবার পাটও আমাদের বড়ো একটা ছিল না। এর মধ্যেই একদিন আমাদের এক আত্মীয়ের মৃত্যুতে মা-বাবাকে খবর পেয়েই যেতে হ'লো। আমি রইলাম বাড়ি পাহারায় আর আমাদের পুরোনো বুড়ি ঝি লক্ষ্মীর মা রইল আমার পাহারায়।

সন্ধ্যেবেলা এ-ঘরে ও-ঘরে ধূপ-বাতি দেখাচ্ছিলাম (এই পুরোনো প্রথাটিও বাবা বর্জন করতে দেননি, তাঁর ধারণা, যতই ইলেকট্রিকের আলো থাক না, সন্ধ্যাবেলা ধূপ আর প্রদীপ না দেখালে সে-বাড়িতে লক্ষ্মী থাকে না), পিছনে পায়ের শব্দে চমকে

মুখ ফেরালাম। যে-কথাটি এতক্ষণ ধ'রে মনের মধ্যে গুনগুন করছিলো, যে-ইচ্ছাটি মনের অবচেতনে ঘুরপাক খাচ্ছিলো, তাই মূর্তি নিয়ে এসে আমার পিছনে দাঁড়ালো। সত্যেনকে দেখেই মুখ নিচু করলাম। একটু ইতস্তত ক'রে দু'পা ঘরে ঢুকে বললে, 'ওঁরা কোথায় ?'

'বাড়ি নেই।'

'তা তো দেখছি—কোথায় গেছেন ?'

'শ্যামবাজার।'

'ও—'

আমার বলা উচিত ছিলো, 'বসুন', কিন্তু কিছুই বলতে পারলুম না। সত্যেন বললো, 'তাহ'লে একটু বসি, না ? এতটা পথ এলুম—'

'বেশ তো—' সহজ হবার খুব একটা চেষ্টা ক'রে ঘরে আলো জ্বেলে বসতে দিলাম। একটু চুপ ক'রে থেকে সত্যেন বললো, 'বসুন।'

'চা ক'রে নিয়ে আসি।'

'আমি কি চা খাবার জন্যেই আসি ?'

বলতে লোভ হ'লো, 'তাহ'লে কী জন্যে আসেন ?' চেপে গিয়ে বললুম, 'তা কেন ? ভালোবাসেন, তাই।'

'চায়ের চেয়েও যা বেশি ভালোবাসি তা-ই তো এ-বাড়িতে আছে—।'

চকিতে চোখ তুলেই নামিয়ে নিয়ে বললাম, 'আপনার বোধ হয় গরম লাগছে এ-ঘরে, একটা পাখা নিয়ে আসি।'

'আপনার আসল উদ্দেশ্যই দেখছি আমার কাছ থেকে

পালানো',—সত্যেন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'তার দরকার কী? আমিই যাই।'

'কী আশ্চর্য!'—একটা মোড়া টেনে ব'সে পড়ে আমি বললাম, 'হ'লো? এবার বসুন।' বলাই বাহুল্য, সত্যেনকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে হ'লো না। ব'সে বললো, 'আচ্ছা, আমাকে দেখলে কি একটা রাক্ষসশ্রেণীর জীব ব'লে মনে হয়? তা নইলে প্রায় দু' মাস ধ'রে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, অথচ আজ পর্যন্ত একটি কথাও আপনি বলেননি আমার সঙ্গে। আমার কোনো-কোনো সময় মনে হয় এখানে এসে অমি হয়তো আপনাকে যথেষ্ট অসুখী করি।'

অস্ফুটে বললুম, 'এ-সব কেন বলছেন? একমাত্র কথা বলাটাই কি সুখ অসুখের চরম লক্ষণ নাকি?'

'তা ছাড়া আর কী ভাবা যায়, বলুন! সত্যি বলতে, এ-বাড়িটি যে আমাকে এত আকর্ষণ করে তার প্রধান কারণই তো আপনার অস্তিত্ব—এ-কথা কি আপনি কখনো মনে করেন না?' লাল হ'য়ে উঠলুম। কাপড়ের আঁচলটা অনর্থক খুঁটতে-খুঁটতে বললুম, 'কী ক'রে জানবো? আপনার মনের কথা তো আমার জানবার কথা নয়!'

'সে তো ঠিকই'—সত্যেন পরম দার্শনিকের মতো মুখ ক'রে ব'সে রইলো। চুপচাপ কাটলো খানিকক্ষণ। তারপর পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে মুখ মুছতে-মুছতে বললো, 'সত্যি বড়ো গরম!'

'রাগ না করেন তো একটা পাখা নিয়ে আসি।'

'আমার রাগে কিছু এসে যায় নাকি?'

আমি হাসলাম।

আমাদের বাড়িতে ফ্যান ছিলো না—উঠে গিয়ে একটা হাত-পাখা এনে হাওয়া করতে যেতেই বাধা দিয়ে বললো, 'ও কী, আমাকে দিন।'

'আমিই করি না।'

'পাগল নাকি ?'

এক হাতে আমার হাত ধ'রে অন্য হাতে পাখাটা কেড়ে নিয়ে বললো, 'আমাকেই বরঞ্চ সেই ভাগ্যটা দিন, আমিই হাওয়া করি, আপনি বসুন।'

ওর স্পর্শে আমার বুকের মধ্যে বিদ্যুৎ ব'য়ে গেল। কথা বলতে পারলাম না। আস্তে-আস্তে হাতপাখাটা নাড়তে-নাড়তে মৃদু হেসে বললো, 'রাগ করলেন নাকি ? কী করবো বলুন—মনে-মনে সর্বক্ষণ এতই কাছের মানুষ ভাবি যে আপনাকে যে আপনি বলছি সেটা পর্যন্ত কানে অস্বাভাবিক ঠেকে। কথা বলছেন না যে ?'

'কী বলবো ?'

'বলবার কি কিছুই নেই ?'

'কতই তো আছে, সবই কি মুখে বলা যায় ?'

বলতে-বলতে হঠাৎ আমি বাইরে চ'লে এলাম। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলাম আকাশের দিকে! ঈশ্বর কি আছেন ? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোটি-কোটি প্রাণীর মনের কথা কি তিনি শুনতে পান ? যদি তাই হয় তবে আজ আমারও একটি প্রার্থনা রইলো তাঁর কাছে। তারপরে গেলাম রান্নাঘরে, বুড়ি ঝি একমনে তরকারি নাড়ছে খুন্তি দিয়ে। বললুম, 'একটু চা হবে, লক্ষ্মীর মা!'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে লক্ষ্মীর মা তাকালো আমার দিকে। বললাম, 'সেই সত্যেনবাবু এসেছেন, উনি খাবেন।'

'কখন এলো? আমাকে ডাকোনি কেন?' আমার বর্তমান অভিভাবিকা ভুরু কুঁচকে আমাকে জেরা করলো। আমি বললুম, 'এই তো—আমি দেখতে পেয়েই তোমাকে চায়ের কথা বলতে এলাম।'

'তাই বলো।' নিশ্চিন্ত হ'য়ে লক্ষ্মীর মা বললো—'চলো আমিও বসিগে ঘরের কাছে।'

সহসা ঘৃণায় আমার শরীর কণ্টকিত হ'য়ে এলো, বুঝলাম, এটা আমার মা বাবার টিপ। নিজের সন্তানকে এত অবিশ্বাসও এঁরা করতে পারেন? কিন্তু এই যে আমি ঈশ্বর সাক্ষী ক'রে আজ আমার সমস্ত মন ওকে দান করলাম তাকে ঠেকাবে কোন প্রহরী! হঠাৎ জেদ্ চাপলো, বললাম, 'তোমার গিয়ে বসবার কী হয়েছে? তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন উনি? চা ক'রে নিয়ে এসো, আমি ও-ঘরে গেলাম্।'

লক্ষ্মীর মা হাঁ হ'য়ে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে, তারপর তরকারির কড়াই নামিয়ে কেট্লিতে জল ভরতে-ভরতে বললো, 'কী জানি বাবা!' আমি সে-কথায় কান না-দিয়ে চ'লে এলাম।

গভীর চিন্তায় সত্যেনের মুখ আনত। আমি যে ঘরে গেলাম অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে-কথা জানতেই পারলো না। সর্বদাই ওর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল, আজ ওর কী হ'লো? একটা নিশ্বাস ফেলে মুখ তুলতেই আমার দিকে দৃষ্টি পড়লো। মৃদু হেসে বললো, 'এখন আমার নিশ্চয়ই ওঠা উচিত।'

'মা-র সঙ্গে দেখা করে যাবেন না?'

'আজ থাক—'

'চা খেয়ে যান।'

'না, ইচ্ছে করছে না।'—আড়মোড়া ভেঙে ও উঠে দাঁড়ালো। তারপর হঠাৎ বললো, 'আচ্ছা, আপনি জাত মানেন?'

আমি কিছু বলবার আগেই আবার বললো, 'আমি মানি না। উপরওয়ালা কেউ আছেন কিনা জানি না, যদি থাকেন তার নামে শপথ করছি আমি যদি মানুষকে তার জাত হিসেবেই গ্রহণ ক'রে থাকি, তিনি যেন আমাকে ক্ষমা না করেন! আমার ইচ্ছে হয় আপনার মধ্যেও যেন সে সঙ্কীর্ণতাটা না থাকে—' ওর উত্তেজনায় আমি একটু অবাক হলাম। বললাম, 'এ-সব কেন বলছেন? কোনো কুসংস্কার যদি আমাকে আচ্ছন্ন ক'রেই থাকে তাহ'লে সময়মতো না-হয় সেটার সংস্কার করা যাবে।'

'আপনার যোগ্যই জবাবটা হয়েছে। রাগ করবেন না—' মার্জনাভিক্ষার ভঙ্গিতে দুই হাত জোড় ক'রে বললো, 'আপনার বাবার মধ্যে এত জাতিবিদ্বেষ আছে যে কখনো মনে হয় এ-বাড়িতে বোধ হয় আমার আসাই উচিত নয়।'

'তাই যদি বলেন—' বাবার হয়ে খানিকটা কৈফিয়ৎ দেবার ভাষায় বললাম—'কোন মানুষটাই বা সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত? তফাৎ খালি বেশি আর কমে।'

'বেশি আর কমকে কি আপনি কম মনে করেন? বেশিওয়ালারা যদি পেছিয়ে থাকেন একশো বছর আগে—তাহ'লে কমওয়ালারা আছেন পাঁচ বছর আগে।'

'তা এখন কী হবে, জাতিভেদ ঘুচে যাওয়া খুব সহজ নয়।'

'আমি তো সহজ কঠিনের কথা বলছি নে,—বলছিলাম ন্যায়

অন্যায়ের কথা। আপনার কি মনে হয় না একটা মানুষকে তার জন্মের জন্যেই ঘৃণা করাটা একটা অমানুষিক নিষ্ঠুরতা?—আর যদি পাপ-পুণ্য মানেন তবে আমি বলবো তার চেয়ে বড়ো পাপ আর জীবনে কিছু হ'তে পারে না।'

আমি বললাম, 'আপনার কী হয়েছে জানি না—যে-সব কথা আপনি বললেন তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। আপনি বিশ্বাস করতে পারেন যে আমার বাবার সংস্কার আমার মধ্যে মোটেও সংক্রামিত হয়নি।'

'সত্যি!' ওর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। স্বভাবসুলভ প্রফুল্লস্বরে বললো, 'একবার চা খাওয়াবার একটা ক্ষীণ আশা দিয়েছিলেন ব'লে যেন মনে হচ্ছে!'

'নিশ্চয়ই, একটু বসুন—'

তাড়াতাড়ি চা ক'রে নিয়ে এলাম। চা খেতে-খেতে ওর স্বাভাবিক আনন্দ ফিরে এলো। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, 'অনুমতি করেন তো আজ যাই—কাল আসবো, কিন্তু দেখা হবে তো?'

'দেখা তো রোজই হয়।'

'ওকে যদি দেখা বলেন—' একটু হেসে উঠে দাঁড়ালো।

আমি গিয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম।

এটা আমার বাবার পৈতৃক বাড়ি। বাড়িটি বড়ো না-হ'লেও খাঁচা নয়। আলাদা-আলাদা ঘর আমাদের তিনজনেরই ছিল। আর যেটি আমাদের বৈঠকখানা ব'লে সাজানো ছিলো সেটি সমস্ত ঘর থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। আমাদের হ'লো কলকাতার খাঁটি বনেদি পরিবার—টাকাটা গেছে কিন্তু ক্ষ'য়ে-ক্ষ'য়েও চালটি কিছু

কিছু আছে। অন্তঃপুরচারিণীদের বুঝি কেউ দেখে ফেললো এটা তাঁদের পক্ষে একটা নিতান্তই ভাবনার বিষয়। বৈঠকখানা ঘরটি আজকাল অমনি প'ড়ে থাকে, বাবার আড্ডা বাইরে। দশটা-পাঁচটা আপিশ করেন—ফিরে এসে খেয়েই বেরিয়ে যান তাসের আড্ডায়, কাজেই আমাদের বৈঠকখানা নামেমাত্র বৈঠকখানা, ও-ঘরটিতে এখন আমার পড়বার ব্যবস্থা হয়েছে।

এর পরে দু'দিন আর সত্যেন এলো না। সকালবেলা আমার যখন ঘুম ভাঙতো কেমন একটা প্রত্যাশায় ভ'রে উঠতো মনটা। প্রতি মুহূর্তে আমি চমকে চমকে উঠতাম। সময় আমার পক্ষে অত্যন্ত দীর্ঘ হ'য়ে গেল। রাত্রিতে যখন সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ হ'য়ে যেতো তখন হৃদয়ভরা জোয়ার আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো অকূলে। ভয়ে আনন্দে আমি বুকের মধ্যে হাত চেপে অভিভূত হ'য়ে থাকতুম। আমি শুনেছিলাম, আজকাল অনেক জায়গাতেই ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে ভালোবেসে বিয়ে করছে, কিন্তু সে ছিলো আমার পক্ষে একটা কল্পনার বিষয়। ও-রকম অসভ্য ঘটনা যে সত্যি-সত্যি ঘটতে পারে এ-কথা আমার মা বাবা অনেক বিশ্লেষণ ক'রেও বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারেননি। অথচ এ-বাড়িতেই যদি কোনো দুর্ঘটনার সূত্রপাত হয়, তাহ'লে? দুশ্চিন্তায় আমার সমস্ত রাতের সব ঘুম কোথায় উড়ে যেতো। বারে-বারে উঠে জল খেতাম আর পাখা দিয়ে হাওয়া করতাম নিজেকে।

হঠাৎ তৃতীয় দিন দুপুরবেলা সত্যেন এলো। বাবা গেছেন আপিশে—মা ঘুমিয়েছেন, আমি বৈঠকখানায় নিজের পড়ার টেবিল গুছোচ্ছিলাম। মৃদু-মৃদু কড়া নাড়বার শব্দে কান খাড়া রেখে বললাম, 'কে?'

'আমি।'

কণ্ঠস্বর শুনে বুকের মধ্যে একটা দ্রুত স্পন্দন অনুভব করলাম। নিশ্বাস ঘন হ'য়ে উঠলো—ত্রস্তে গায়ের কাপড় ঠিক করতে-করতে দরজার ছিট্‌কিনি খুলে দিয়ে বললাম, 'এই অসময়ে?'

গ্রীষ্মের দুপুর। রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে ঘাম মুছতে মুছতে বললো, 'উঃ, পুড়ে গিয়েছি, এক গ্লাশ জল দেবেন?'

ওর ঘর্মাক্ত টুকটুকে মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যি কষ্ট হ'লো। ঘরের কোণে কুঁজো ছিল, এক গ্লাশ জল এনে টেবিলের উপর রেখে বললুম, 'এই রোদ্দুরে নাকি মানুষ বেরোয়!'

'না বেরুলে কি আপনার সঙ্গে দেখা হয়?'

'সকালে বিকেলে কি আমি বাড়ি থাকি না?'

'থাকতে পারেন—আমি তা দেখতে পাইনে।'

'কী ক'রে জানলেন আমার সঙ্গে দেখা করবার এটাই উৎকৃষ্ট সময়?'

সত্যেন হাসলো, বললো, 'সত্যি বলতে এইমাত্রই এ-কথাটা জানলাম, কেননা দু'দিন আমি অসুস্থ ছিলাম, আসতে পারিনি, আজ খানিক আগে মনে হ'লো, বেশ তো ভালো আছি—আর এ-কথা মনে হওয়া মাত্রই ব্র্যাকেট থেকে পাঞ্জাবি টেনে গায়ে দিলাম, তারপর সোজা এখানে। আর আসামাত্রই আপনাকে দেখতে পেলাম।'

অসুখ শুনে একটু উদ্বিগ্ন হ'য়ে বললাম, 'ছি ছি, ঐ শরীর নিয়ে রোদ্দুরে বেরুনো মোটেই উচিত হয়নি। আর কখনো ও-রকম করবেন না—'

'তথাস্তু! কিন্তু নতুন কোনো অসুখ আমার আর শিগগির হবে না—এ আপনি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতে পারেন।'

হঠাৎ আমার লক্ষ্য হ'লো যে ও এখনো পর্যন্ত জলের গ্লাশটা হাতেই ধরে আছে—হেসে বললুম; 'জলটা খেয়ে নিন।'

'দেখছেন, কী আশ্চর্য, এখানে এসেই এত ঠাণ্ডা হয়েছি যে যে-জলতেষ্টায় আমার কেবল প্রাণটাই বেরিয়ে যেতে বাকি ছিলো সেই তেষ্টা পর্যন্ত মিটে গেছে।' ঢকঢক ক'রে সমস্ত জলটা একসঙ্গে খেয়ে নিয়ে ঠাশ ক'রে গ্লাশটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলো।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আপনার ভগ্নীপতি সুধীন-বাবু যে দিল্লী বদলি হচ্ছেন, জানেন?'

'না তো।'

'আমাকেও নিয়ে যেতে চাইছেন।'

'কেন?'

'ওর ধারণা এখানে আমি কেবল একটা ব্যবসার অছিলা নিয়ে আছি, আসলে কিছুই করছি না—ওখানে একটা চাকরির সন্ধান দিয়েছে ও।'

'বেশ তো।'

'যাবো নাকি?'

'এই দুর্দিনে একটা চাকরি কি অবহেলার যোগ্য?'

'ওরে বাবা, আপনি যে একেবারে গুরুজনের মতো কথা বলছেন, কিন্তু আপনি কি জানেন যে পৃথিবী উল্টে গেলেও আমি আর কলকাতা ছাড়তে পারি না।'

হঠাৎ আমি গরম বোধ করলাম। মনে হ'লো কান দুটো

যেন জ্ব'লে যাচ্ছে—কিছু জবাব না-দিয়ে হাত-পাখাটা নাড়তে লাগলাম।

'অসময়ে এলাম ব'লে রাগ করেননি তো?' আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখেই বোধ 'হয়' বললো কথাটা। আমি হঠাৎ ক'রেই বললাম, 'রাগ করলেও কি আপনি তা শুনবেন?'

'বা রে, আপনি দেখছি আমাকে বেশ প্রশ্রয় দিচ্ছেন। কিন্তু আমি দিল্লী যাবো কি যাবো না তা তো কিছু বলছেন না।'

'এর মধ্যে আমার কি কিছু বলবার আছে?'

'একমাত্র আপনারই তো আছে।'

'আশ্চর্য।' আমি অন্য প্রসঙ্গ তোলবার অভিপ্রায়ে বললাম, 'মা ঘুমুচ্ছেন—একটু পরেই বোধ হয় উঠবেন। আপনার যাবার তাড়া আছে?'

'তাড়া তো আপনিই করছেন দেখছি। বিরক্ত বোধ করলে আমি নিশ্চয়ই উঠে যাবো', হঠাৎ চেয়ার ঠেলে শব্দ ক'রে ও উঠে দাঁড়ালো।

দু'পা এগুতেই আমি বললাম, 'এই রোদ্দুরে আবার এক্ষুনি ফিরে যাবেন—তারপর যদি কোনো অসুখ-বিসুখ করে তাহ'লে আমি দায়ী হবো নাকি?'

'অসুখ বলতে আপনি দেখছি কেবল শরীরটাই বোঝেন।'

'যাই বুঝি না কেন—আপনি রোদ না পড়লে যাবেন না এই আমার অনুরোধ।'

আমার কথায় গ্রাহ্য না ক'রে সত্যেন বললো, 'আমার ভালো লাগছে না বেশি, কোনোরকমে বাড়ি গিয়ে উঠতে পারলেই বাঁচি এখন। অনর্থক এলাম, আপনাকেও বিরক্ত করলাম—'

'বিরক্ত হয়েছি এ-কথা তবুও বলবেন ?'

'বলবো না ?'

'না।'

'সত্যি ?'

'জানি না—' আমি রাগ ক'রে মুখ ঘোরালাম। সঙ্গে-সঙ্গে ধাঁ ক'রে আমার কাঁধের উপর হাত রেখে বললো, 'বা, কথায়-কথায় এরকম রাগ করলে চলে নাকি ?'

আমি চমকে উঠলাম। আমার স্তম্ভিত ভাব দেখে হঠাৎ থতমত খেয়ে গেলো। হাত উঠিয়ে নিয়ে অত্যন্ত মৃদু গলায় বললো, 'মাঝে-মাঝে নিজেকে একেবারেই সামলাতে পারি না। তোমাকে বলাই ভালো যে আমি তোমাক ভালোবাসি।'

আমি আরক্ত হ'য়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকলাম, তারপর আস্তে-আস্তে ঘর থেকে চ'লে এলাম। মা-র ঘরে এসে দেখলাম, তিনি হাতে মাথা রেখে অকাতরে ঘুমুচ্ছেন, খাটের নিচে আঁচল পেতে নাক ডাকাচ্ছে লক্ষ্মীর মা। খানিকটা যেন স্বস্তি পেলাম। কুঁজো থেকে এক গেলাশ জল ঢেলে মুখে ঝাপটা দিলাম, মাথার উপর হাতটা রেখে দেখলাম সেখান থেকে যেন আগুন বেরুচ্ছে। অনেকক্ষণ ভেবে পেলাম না, এ-জন্যে সত্যেনকে ক্ষমা করবো কি করবো না। তারপর একসময়ে যন্ত্রের মতো আবার গেলাম ও-ঘরে, ততক্ষণে সত্যেন বোধ হয় অর্ধেক পথ চ'লে গেছে। ঘরে গিয়ে যেখানটায় ও বসেছিলো, সেখানটায় বসলাম একবার, একবার উঠলাম—অত্যন্ত অস্থিরভাবে পায়চারি করতে-করতে হঠাৎ মনে হ'লো এর চেয়ে বড়ো সুখ পৃথিবীতে আর কী আছে ? সমস্ত শরীর বিহ্বল হ'য়ে এলো—দুই চোখ জলে ভ'রে

গেলো, দু'হাত মুচড়ে-মুচড়ে নিজেকে সামলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলাম।

পরের দিন সকালবেলা এলেন সুধীনবাবু। ভদ্রলোক আসেন খুবই কম—মা ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন জামায়ের পরিচর্যায়—বাবার সময় ছিলো না, তবুও আপিশে যাবার সেই ব্যস্ততার মধ্যেই তিনি হঠাৎ সুধীনবাবুকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গেলেন। আমার মনের মধ্যে অনেক কথার ঢেউ ব'য়ে গেলো।

একটা আশার বিদ্যুৎ যেন আমাকে আড়ালে কান পাততে প্ররোচিত করলো! বাবা বললেন, 'মিতুর এবার বিয়ে দিতে চাই।'

'খুব ভালো কথা, অত সুন্দর মেয়ে, তার আর ভাবনা কী?'

'বিয়ের প্রস্তাব কিন্তু তোমাকেই করতে হবে।'

'আমাকে!' আশ্চর্য হ'য়ে সুধীনবাবু বললেন, 'আমি কার সঙ্গে প্রস্তাব করবো?'

'তোমারই তো বন্ধু সত্যেন।' আমার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। সুধীনবাবু অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'সে হ'তে পারে না।'

'কেন? কেন হ'তে পারে না—তুমি কি মনে করো আমার মেয়ে ওর যোগ্য নয়?'

'সেজন্য নয়, মেশোমশায়—কারণটা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। তবে এটুকু জানবেন যে এ বিয়ে হ'তে পারে না।'

নিশ্বাস ফেলে অত্যন্ত হতাশ হ'য়ে বাবা বললেন, 'তাহ'লে আমি নিজেই তাকে ব'লে দেখবো'খন। ওর ওপরে সত্যি আমার বড়ো মায়া পড়েছে।' সুধীনবাবু একটা নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ও কি এ-বাড়িতে মাঝে-মাঝে আসে নাকি?'

'মাঝে-মাঝে বলো কী, ও তো প্রায় রোজই আসে। তোমার মাসিমা যে ওকে ছেলের মতো ভালোবাসেন।'

'মিতুর সঙ্গে দেখা হয়?'

'খুব কম। মিতু যা লাজুক—ও আবার বেরুবে কারো কাছে।'

সুধীনবাবু বললেন, 'হুঁ।'

মা এসে বললেন, 'শ্বশুর জামায়ে কী এমন রাজকার্যের পরামর্শ হচ্ছে? এসো সুধীন, একটু চা খাবে। মিতু কই?'

'যাই মা,' ব'লে আমি পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম। এর পরে যতক্ষণ সুধীনবাবু ছিলেন ওঁকে বেশ গম্ভীর মনে হ'লো। সহসা আমার মনে হ'লো আমার অন্তরায় একমাত্র মালতীদি। আমি জানি মালতীদিও সত্যেন সম্বন্ধে একটু দুর্বল। আর সুধীনবাবু যখন ওর নিজের ভগ্নীপতি তখন মালতীদির স্বার্থটাই তিনি বড়ো ক'রে দেখবেন। আমার বিবাহের প্রস্তাবে ওঁর আপত্তির একটা কারণ খুঁজে পেয়ে আর মালতীদির মতো সর্ব্বগুণসম্পন্না একজন মেয়েকে প্রতিযোগী পেয়ে আমার মনের মধ্যে ছোটোখাটো একটি বিপ্লব উপস্থিত হ'লো। ইচ্ছাশক্তির যদি সত্যিই কোনো জোর থাকতো তাহ'লে সেই মুহূর্তেই সত্যেনকে দেখতে পেতাম এ-বাড়িতে। কিন্তু সে এলো না। সেদিন না, তার পরের দিন না, তার পরের দিনও না। আমি আর থাকতে পারলাম না। সেদিন ওকে যে ক'রে বিদায় দিয়েছিলাম, তারপর কি আত্মসম্মানসম্পন্ন কোনো মানুষ আর আসতে পারে? নিজেকে সারারাত সারাদিন কত রকম ভৎর্সনাই যে করলাম তার ঠিক নেই। অবশেষে মাকে বললাম, 'মা, কদ্দিন মাসিমার বাড়ি

যাই না, চলো না আজ ঘুরে আসি—আজ তো রোববার, বাবাই নিয়ে যাবেন।'

মা ঈষৎ চিন্তা ক'রে বললেন, 'সত্যি আজ গেলেও হয়, তোর বাবা তো আবার আড্ডায় বেরুলেন।'

আমার মন ছিলো সন্দেহে ব্যাকুল—সুধীনবাবুই যে চক্রান্ত ক'রে প্রত্যেক দিন ওকে মালতীদির কাছে নিয়ে যাচ্ছেন না তাই বা কে জানে। হাজার হোক, আমার সঙ্গে মালতীদির কোনো তুলনাই হয় না। ওরা মেলামেশা জানে—ভদ্রলোকের সঙ্গে ব্যবহার জানে। আর আমি তো একটা কূপমণ্ডুক। বললাম, 'বাবা তো আর দিন কাটিয়ে আসবেন না, একটু না-হয় দেরিতেই যাবো।' আমি কথা বলতে-বলতে মা-র পিছন-পিছন রান্নাঘর ছাড়িয়ে উঠোনে এসে পা দিতেই থমকে গেলাম। দেখলাম, অত্যন্ত বিস্রস্ত চেহারায় সত্যেন এসে ঢুকলো বাড়িতে। যাকে নিয়ে মনে-মনে এত যন্ত্রনা তাকে দেখে সত্যি আমার হাত-পা যেন ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো। এতো বড় একটা বিপদের সামনে যেন জীবনে এই প্রথম দাঁড়ালাম। চোখে চোখ পড়তেই মুখ নিচু করলাম। মা পিছন ফিরে ছিলেন—অস্ফুটে বললাম, 'মা, ছাখো।'

মুখ ফিরিয়েই মা খুশি হ'য়ে উঠলেন, 'এসো, এসো, ক'দ্দিন তোমার দেখা নেই। মাসিমাকে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলে?'

'না, মাসিমা, আমার স্মরণশক্তির অত দুর্নাম দেবেন না। সময়ই পাইনি ক'দ্দিন—আর দেখাশোনার তো আজই শেষ।'

আমার বুকের মধ্যে ধড়াশ ক'রে উঠলো। মা বললেন, 'তার মানে?'

'আমি তো পরশুদিন সুধীনের সঙ্গে দিল্লী যাচ্ছি। একটা চাকরি নিলাম।'

সত্যেন আড়চোখে আমার দিকে তাকালো। 'চাকরি পেলে? সে তো খুবই সুখের কথা। তাই ব'লে দেখা হবে না কেন? আবার নিশ্চয়ই আসবে।'

'কে জানে!'

মা বললেন, 'বোসো—আজ আর সহজে ছাড়ছিনে—একেবারে খেয়ে যাবে এখানে।'

'না, মাসিমা—আমায় আবার যেতে হবে অন্য জায়গায়।'

অন্য জায়গায় মানে তো মালতীদির ওখানে—মনে-মনে আমি সুধীনবাবুর মুণ্ডপাত ক'রে সেখান থেকে ঘরে এলাম।

খানিক পরে মা এসে বললেন, 'তুই একটু যা মিতু ও ঘরে—আমি মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে আসি—বেলা হ'লো, রান্না চাপাবো কখন?'

আমাদের সংসারে এই আরেকটি প্রথা ছিলো—বাবা কখনো ঠাকুর-চাকরের হাতের রান্না খেতেন না। মা বেরিয়ে যেতেই অতি সন্তর্পণে আমি ও-ঘরে গেলাম। ঘরটি আমার বাবার বিশ্রামকক্ষ। হাত-পা ছড়াবার জন্যে একটি ডেক চেয়ার, ছোটো নিচু খাটে একটি বিছানা আর মোটা-মোটা তাকিয়া আর দু' একটি বেতের চেয়ার আছে ঘরটিতে। যারা নিতান্ত আপন হয়েছে এমন পুরুষমানুষরাই এ ঘরে এসে বসে। এসে দেখলাম, একটা খবরের কাগজের পাতা ওলটাচ্ছে! আমাকে দেখেই সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো। আমি বললাম, 'বসুন।'

'আপনি বসুন—' ওর মুখের ভঙ্গি ও আপনি সম্বোধনে আমি

অবাক হলাম। এ-ক'দিনেই আমি ওর আপনি হ'য়ে গেলাম! ওর তুমিটি কে?'

ব'সে বললাম, 'শুনলাম দিল্লী যাচ্ছেন।'

'তাই তো ঠিক হয়েছে।'

'ঠিক করবার কর্তাটি বোধ হয় স্থধীনবাবু?'

'হ্যাঁ, স্থধীনই বললো আর এখানে থাকা ঠিক হবে না।'

'ও—।' মনে-মনে বললাম, 'স্থধীন আর কী জপালো?' আমাব গম্ভীর মুখ লক্ষ্য ক'রে বললো, 'আমার উপর আপনি রাগ করেছেন, বুঝতে পারছি। আমি ভুল বুঝেছিলাম। আমার সেদিনকার অপরাধ মার্জনা করুন।'

'কোন অপরাধ?' আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। আমাকে ভালোবাসা যে অপরাধ এ-বিষয়ে অবহিত হয়েছেন উনি? বুকের মধ্যে একটা জ্বালা বোধ করলাম।

মাথার চুলে আঙুল চালাতে-চালাতে বললো, 'সত্য কথা মুখে বলাটাই অপরাধ তাহ'লেই তা অসভ্যতার পর্যায়ে দাঁড়িয়ে যায়।'

'সত্য কথা!' আমার মুখ থেকে কথাটা যেন খ'সে পড়লো—ভাঙা গলায় বললুম, 'যা সেদিন সত্য ছিলো তা কি আজো সত্য আছে?'

'চিরদিন তা সত্যি হ'য়ে লুকিয়ে থাকবে আমার বুকের মধ্যে।'—সত্যেন হাতের মধ্যে মুখ গুঁজলো। আমি সভয়ে এদিক-ওদিক তাকালাম—তারপর উঠে এসে আস্তে তার কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'শোনো—' বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সত্যেন মুখ তুললো আমার দিকে—নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ—

তারপর আমার হাতের উপর হাত রেখে আস্তে বললো, 'আর আমার ভয় কী!'

বাইরে যেন কার পায়ের শব্দ পেলাম। ত্রস্তে স'রে এলাম ওর সান্নিধ্য থেকে—মৃদু গলায় বললাম, 'কাল দুপুরে এসো।'

বাইরে এসে দেখলাম, লক্ষ্মীর মা বাজার নিয়ে আসছে।

তারপরে সমস্ত দিন আমার লঘুপক্ষে ভর ক'রে কাটলো। স্নিগ্ধতায় আর প্রশান্তিতে সমস্ত শরীর-মন আবিষ্ট হ'য়ে রইলো। আর পরের দিনের প্রত্যাশায় আজ থেকেই বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্পন্দন অনুভব ক'রে শিহরিত হ'তে লাগলাম।

পরের দিন ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় দুটোর সময় ও এলো। আমি উন্মুখ হ'য়েই ছিলাম—দরজা খুলে দিয়ে বললাম, 'এসো।'

'মাসিমা ঘুমিয়েছেন?'

'অনেকক্ষণ।'—সত্যেন নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসলো। আমি হাত-পাখা এনে হাওয়া করতে-করতে বললাম, 'কষ্ট হয়েছে আসতে? বড়ো রোদ।'

'সমস্ত ক্লান্তি তো তুমিই দূর ক'রে দিলে—' হাত বাড়িয়ে বললো, 'পাখাটা দাও।'

'আমিই হাওয়া দিচ্ছি।'

'ভারি লজ্জা করছে, মনে হচ্ছে যেন জুলুম ক'রে সেবা নিচ্ছি।'

লজ্জিতমুখে বললুম, 'জুলুম ক'রে তো সবই নিলে—সেবাতেই বা অত আপত্তিটা কী?'

'জুলুম ক'রে বুঝি?'

'তা নয়তো কী—'

'জুলুম ক'রে না—' আমার সামনে ঝুঁকে প'ড়ে বললো, 'বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে।'

'তাই নাকি ?'—আমি হাসলাম।

'এই বুঝি হাওয়া দিচ্ছো ?'

জোরে-জোরে হাওয়া দিতে-দিতে বললাম, 'আর কতক্ষণ দেয়া যায় !'

'তাহ'লে দাও আমাকে।—তুমি যদি কখনো এ-রকম রোদ্দুরে পুড়ে আমার কাছে আসতে, আমি কী করতাম, জানো ?'

'কী ?'

'নিজের কাপড় দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দিতাম—পাখা দিয়ে হাওয়া করতাম না, ফুঁ দিয়ে জুড়িয়ে দিতাম ক্লান্তি।'

আমি বললাম, 'ঈশ্‌!' সত্যেন একটু চিন্তা ক'রে বললো, 'আমার তো কালকেই দিল্লী যাবার কথা—তার আগে একটা বোঝাপড়া দরকার।'

বোঝাপড়ার অর্থ আমি বুঝলাম। সংকুচিত হ'য়ে বললাম, 'সে তুমি বাবার সঙ্গে কোরো। বোঝাপড়ার জন্য তিনিও উৎসুক !'

'উৎসুক !'

'আমার তো তাই মনে হয়।'

'কিন্তু কিছুতেই তিনি আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন না।'

'আমি বলছি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।'

'আচ্ছা যদি উনি রাজি না হন—'

'হবেন, হবেন, হবেন—'

'কিন্তু ধরোই না, যদি না হন—'

'না হ'লে ?'—আমি ভেবে পেলাম না, না-হ'লে কী করবো।'

'না হ'লে তুমি রাজি আছো তো ?'

'আমার কথা তো তুমি জানো—'

'তাই ভালো—আর কারো কথা দিয়ে আমরা কী করবো—' পকেট থেকে একটি ছোট্ট কেস বের ক'রে সত্যেন বললো, 'এই আংটিটা আজ তোমাকে পরিয়ে দিলাম, কাল আবার আসবো এ-সময়ে—যদি আমাকে গ্রহণ না করো এটা ফিরিয়ে দিয়ো।'—আংটি পরিয়ে বুক-পকেট থেকে একটা চিঠি বের ক'রে আমার হাতে দিয়ে বললো, 'আমি চ'লে গেলে অতি নিভৃতে এই চিঠিটা তুমি পোড়ো।'

তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি যাই। মন বড়ো ব্যাকুল।'

শক্ত ক'রে আমার দু'হাত একেবারে জড়িয়ে ধরলো, তারপর দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। ওর ভাবভঙ্গিতে আমি ঈষৎ অবাক হলাম। আংটি-পরা আঙুলটির দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ নিচু হ'য়ে নিজের আঙুলকেই চুম্বন করলাম। তারপর নীল পুরু খামটির মুখ ছিঁড়ে চিঠিখানা বের ক'রে পড়লাম।

'সুমিত্রা,

আমি আজ একটা গভীর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। হয় চির-অমৃত নয় চির-নরক। তোমাকে বলেছিলাম মানুষ মানুষই, জাতটাই তার পরিচয় নয়—আশা করি তা তুমি মর্মে গ্রহণ ক'রে আমাকে এই অতল থেকে উদ্ধার করবে। তোমাদের হিন্দু সমাজে জাতের ছোঁয়াছুঁয়িটা যে কী ভীষণ পাপ সে-বিষয়ে তোমাদের একটু অবহিত হওয়া দরকার। আমার বাবা মুসলমান

—আমার নিজের কোনো ধর্ম নেই। আমার পৈতৃক নাম ইয়ুসুফ, সবাই ডাকে সুফি।'

সুফি! মুসলমান!

ছি, ছি, আমি মুসলমানের প্রণয়ে আবদ্ধ? আমার হাত থেকে থরথর ক'রে কেঁপে চিঠিটি খ'সে পড়লো। আমার মনের মধ্যে আমার সমস্ত পূর্বপুরুষ বিদ্রোহ ক'রে উঠলো; দুই হাত জোড় ক'রে বুকের উপর রাখলাম—যিনি সকলের অন্তর্যামী তাঁকে স্মরণ করলাম—তাঁর চোখে কী সত্যেন, মুসলমান! খৃষ্টান! হিন্দু! না মানুষ? আমি কি তাঁর চোখে অতি পবিত্র হিন্দু বংশোদ্ভূত শ্রীমতী সুমিত্রা দেবী, না সত্যেনের মতোই কেবলমাত্র একটি মানুষ? আমি যাকে ভালোবাসি, সে কি ঐ মানুষটিই নয়? সে কি ওর জাত? ঈশ্বর, আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে দয়া করো—আমাকে শক্তি দাও ভালোবাসতে—আমি দুই হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলাম। মিনিটখানেক ছেড়ে দিলাম নিজেকে, তারপর উঠে দরজায় খিল বন্ধ ক'রে চিঠির বাকি অংশটুকু প'ড়ে ফেললাম।

'হয়তো যে-মুহূর্তে আমি সত্যেনের বদলে সুফি হবো সেই মুহূর্তে তোমার সমস্ত ভালোবাসা কর্পূরের মতো হৃদয় থেকে উবে যাবে। যদি তাই যায় তবে যাক—তাহ'লে বুঝবো যে মানুষের হৃদয়টাও একটা সংস্কারের সমষ্টি—সেখানেও সে চুলচেরা বিচার ক'রে তবে কাজ করে। তুমি হয়তো ভাবছো এ-ভাবে হিন্দু সেজে বিশ্বাসঘাতকতা করবার দরকার ছিলো কী! প্রথমটায় এ একটা নিছক ফাজলেমির থেকেই শুরু, সুধীনই আমাকে অনুপ্রাণিত করে। সুধীন আমাকে অকৃত্রিম ভালোবাসে—ওর বিয়ের খবরে আমার চেয়ে কার বেশি আনন্দ হয়েছিলো। অথচ জাত আমাদের

এতই আলাদা যে সে-বিবাহে হিন্দু না-সাজলে আমার কোনো অংশই থাকতো না। আমি রাজি হইনি—সুধীন বললো, 'নিশ্চয়ই তুই সত্যেন হবি। কেন, সত্যেন হ'তে তোর বাধা কী! বিয়েতে যাবি, একসঙ্গে খাবি—আটদিন ধ'রে আনন্দ করবি। মানুষের মিথ্যা সংস্কারের জন্য কি আমরা দায়ী? ও-রকম অবোধ যারা, মুর্খ যারা—মানুষকে জাত দিয়েই যারা বিচার করে, তাদের সঙ্গে ছলনা করলে কোনো পাপ হয় না। আর তুই তো কোনো ধর্মই মানিস না—তোর সত্যেনই বা কী সুফিই বা কী!' একটু ভয়-ভয়ও করলো, মজাও লাগলো খুব। কিন্তু চুকে যেতো ঐখানেই যদি না তোমার সঙ্গে দেখা হ'তো। জানো তো, কোনো-কোনো ভালোবাসা এক পলকেই আত্মপ্রকাশ করে। সেদিন বাড়ি গিয়ে মনে-মনে ভাবলাম, আমি তো আর চেহারা বদলাইনি, চরিত্রও বদলাইনি—বদলেছি জাতি, যেটা মানুষের মনুষ্যত্বের তিলমাত্র প্রকাশ নয়। মানুষ ছোটো বড়ো তার চরিত্রে—বিদ্যায় বুদ্ধিতে আর নম্রতায়। আমি যতটুকু বিদ্বান তার চেয়ে বেশি ভান করিনি—যতটুকু বুদ্ধি তার বেশি দেখাইনি—আর আমার চরিত্র তো সুধীন জানে। তুমিই ভেবে দেখো অন্যায় আমি কী করেছি। যে মুহূর্তে তোমাকে দেখলাম, আবার দেখবার ইচ্ছায় আমি পাগল হ'য়ে গেলাম—তারপর যতবার দেখলাম ততবার আবার দেখবার দুর্নিবার ইচ্ছায় এ-মিথ্যা জাতকে আমি আঁকড়ে রইলাম। কিন্তু আর নয়—এবার যদি আমি মুসলমান ব'লে তোমার ভালোবাসায় তিলমাত্র চিড় না ধরে তাহ'লে ঐ আংটি তুমি খুলো না, এই আমার মিনতি। আর আমাকে ক্ষমা কোরো।

তোমার ইউসুফ।'

চিঠিটি ভাঁজ ক'রে নিশ্বাস ছাড়লাম। কোলের উপর প'ড়ে রইলো খোলা চিঠি—জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, গাছের পাতায়-পাতায় রোদ ঝিকমিক করছে। মন উধাও হ'যে গেলো। পরের দিন সকালের ডাকে বাবার নামে একখানা চিঠি এলো—চিঠিখানা পড়তে যতটুকু সময়—তারপরেই হঠাৎ যেন বাবার গলায় বোমা ফাটলো। চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি শালা জোচ্চোর ব'লে শূন্যে লাফিয়ে উঠলেন। ছুটে গেলেন মা—'কী হয়েছে, কী হয়েছে?' মা'র গলায় অস্থিরতা ফুটে উঠলো। 'শালাকে আমি জেল খাটাবো—সুধীনকেও বেহাই দেবো না জামাই ব'লে। হারামজাদা—লম্পট—' বাবা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন, মা কিছুই বুঝতে না-পেরে খালি এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন—হঠাৎ তাঁর নজর পড়লো চিঠিটার দিকে। তাড়াতাড়ি সেটি কুড়িয়ে নিয়ে এক নিশ্বাসে প'ড়ে নিয়ে অনুচ্চ স্বরে বললেন, 'চুপ করো তো তুমি, তোমার কি মাথা খারাপ হ'লো? ঘরে এসো।' হায়-হায় করতে করতে বাবা ঘরে গেলেন—ফিশ-ফিশিয়ে মা বললেন, ''বুড়ো বয়েসে আর কেলেঙ্কারী কোরো না। চ্যাঁচামিচি ক'রে এখন রাজ্য-সুদ্ধ লোককে জানাও যে রাতদিন একটা মুসলমান এ-বাড়িতে আসতো, খেতো একসঙ্গে, বসতো একসঙ্গে, একসঙ্গে ছোঁয়াছুয়ি—একাকার। চেপে দাও—জাত আবার কী? চেপে গেলেই হ'লো।' বাবা তক্ষুনি ঢোক গিলে চেপে গেলেন, কিন্তু জাতিসাপের মতো চাপা গর্জনে কপাল চাপড়িয়ে ক্রমাগত মুখ খারাপ করতে লাগলেন। আমি এতক্ষণ হতবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এবার যেন কিছু বোধগম্য হ'লো—মা'র হাত থেকে চিঠিখানা টেনে নিয়ে পড়লাম—চিঠিখানি সুধীনবাবুর লেখা—

'শ্রীচরণেষু,

আমি নিজে কোনো জাত মানি না। আমার বন্ধু সত্যেন যে আমার কতখানি তা আপনারা অনুমান করতে পারবেন না। আমার বিবাহের আনন্দের কোনো অংশই যদি সে গ্রহণ না করতো আমার পক্ষে সে-আনন্দ অসম্পূর্ণ হ'তো, কিন্তু সে উৎসব-সভায় যোগদান করবার তার কোনো অধিকার থাকতো না, যদি না তার নাম আমি সত্যেন রাখতাম।

আমি জানতাম না সেই নামটি ভাঙিয়ে সে এখনো আপনার ওখানে যাতায়াত করে। এটা তার পক্ষে বোধ হয় উচিত হয়নি —আপনি ভুল বুঝবেন না, আমি তার চরিত্রের কথা বলছি না— বিদ্যায় বুদ্ধিতে চরিত্রে সে সত্যিই অসাধারণ, কিন্তু তার নাম সত্যেন নয়, ইউসুফ—তার বাবা মুসলমান।'

চিঠিটা প'ড়ে আর আমি জাত খোয়াবার ঐ মর্মবিদারক দৃশ্য দেখবার জন্য দাঁড়ালাম না। বাবারও আপিশের বেলা হয়ে গিয়েছিলো, বেশিক্ষণ বিলাপ করবার আর সময় হ'লো না। আপিশে যাবার সময় কেবল বললেন, 'হারামজাদা মোছলমানের বাচ্চাকে আমি ফাঁসিকাঠে ঝোলাবো।'

যে মানুষটাকে মা কালও সন্তানের অধিক স্নেহ করেছেন, তিনিও নির্বিকার মুখে ব'লে উঠলেন, 'তা-ই উচিত।'

মানুষ কেবল ভালোকেই ভালবাসে না—চোর জোচ্চোর লম্পট বদমাস এমন লোককেও একজন মানুষ হয়তো কত গভীরভাবে ভালোবাসে দেখেছি, কিন্তু সে যদি বিজাতি হয়, তাহ'লেই কেন সব নিঃশেষে চুকে যায়? বুকের মধ্যে সত্যি কেমন ক'রে উঠলো। এই অন্যায়, এই নির্মমতা—এই অহেতুক জাতিবিদ্বেষ

কি আমাকেও স্পর্শ করবে? আমার ভালাবাসাকেও কলঙ্কিত করবে?

স্নান ক'রে যখন খেতে বসলাম, মা বললেন, 'লোকটাকে তখনই আমার ভালো মনে হয়নি—তখনই মনে হয়েছিলো আসলে একটা বদ লোক—'

আমি মৃদু গলায় বললাম, 'মানুষটা আর বদ কী—জাতে মুসলমান এই যা অপরাধ।'

'ও মা, তুই বলিস কী, মিতু? জাত ভাঁড়িয়ে সকলের জাত ও মারলো, ও কি একটা কম নরক? ওটার মুখ দেখলেও যে পাপ হয়—'

নিঃশ্বাস ছেড়ে চুপ ক'রে খেয়ে উঠলাম। মা-ও খেয়ে উঠে আঁচাতে-আঁচাতে বললেন, 'কাউকে এ-সব বলিসনি, বুঝলি? লোক জানলেই ভয়' নইলে আর কী! তোর বাবা আবার যা গোঁয়ার মানুষ—এ নিয়ে আবার হাট না করেন তাই ভাবি।'

মা ঘুমুতে গেলেন, আমি গেলাম বৈঠকখানায়। গিয়ে প্রথমেই খিল বন্ধ করলাম, তারপর প্রতিমুহূর্তে আশায় আর প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হ'য়ে উঠলাম। অনেকক্ষণ পরে, আমার মনে হ'লো বোধ হয় এক যুগ পরে দরজার কড়া ন'ড়ে উঠলো। কাল আংটিটা আমি খুলে রেখেছিলাম, বুকের মধ্যে থেকে বার ক'রে তাড়াতাড়ি আঙুলে পরে নিয়ে খুব আস্তে দরজা খুলে দিয়ে অত্যন্ত নিচু গলায় বললাম, 'এসো।' ঘরে ঢুকে প্রথমেই তাকালো আমার হাতের দিকে—সঙ্গে-সঙ্গে আশায় আনন্দে ওর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো—ভারি গলায় বললো, 'আমাকে ক্ষমা করেছো?'

'ভালোবাসাকে কি অপরাধ হার মানাতে পারে?'

'জাত ?'

'জাতটা তো অপরাধ নয়।'

'তুমি আমাকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করোনি ?'

'গ্রহণ তো তোমাকে আগেই করেছিলাম—আমি প্রস্তুত—আমাকে তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাবো।'

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যেনের চোখ ছলছল ক'রে উঠলো, রুদ্ধ কণ্ঠে বললো, 'আমাকে তুমি এত ভালোবাসো ? আমি কি এ-দানের যোগ্য !'

কোনো কথা আমি মন দিয়ে শুনতে পারছিলাম না, আতঙ্কিত চোখে চারদিকে তাকিয়ে অস্থির গলায় বললাম, 'আমাকে কী করতে হবে, বলো—এ বাড়িতে আর একদণ্ডও তোমার থাকা উচিত হচ্ছে না।'

'সবাইকে বলেছো ?'

'সুধীনবাবুই জানিয়েছেন।'

বিষণ্ণ চোখে সত্যেন আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, 'আমার কৃতকর্মের জন্য ওঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত, অন্তত মাসিমার কাছে—তাঁকে আমি সত্যিই ভালোবাসি।'

'ও-সব ভুলে যাও—'

'ওঁরা কি আমাকে ক্ষমা করবেন না ?'

'অসম্ভব।'

সত্যেন নিশ্বাস ছেড়ে চুপ ক'রে রইলো। আমি বললাম, 'আর তুমি এ-বাড়িতে এসো না।'

'তুমি ?'

আমি জবাব দিলাম না।

আমাকে বোঝাবার চেষ্টায় বললো, 'মা-বাবাকে ছেড়ে গিয়ে যে দুঃখ তুমি পাবে তা ভ'রে দিতে পারবো কিনা জানি না, কিন্তু বিশ্বাস করো আমি কখনোই তোমাকে কোনো দুঃখ দেবো না। বিবাহ দ্বারা মেয়েরা সর্বদাই বাপ-মার সান্নিধ্য-সুখ থেকে কোনো-না-কোনোদিন বিচ্ছিন্ন হয়ই—তুমিও হবে—' একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আমি অনেক ভেবেছি, তুমি মন শক্ত করো, আমি আজ রাত এগারোটার পর গাড়ী নিয়ে আসবো—'

'তাই হবে, তুমি এবার যাও—' আমি আর এক মুহূর্ত ওকে থাকতে দিলাম না, প্রায় ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলাম।

বিকেলবেলা বাবা আপিশ থেকে এসে বললেন, 'ওকে আমি ছাড়বো না, কিছুতেই ছাড়বো না—বুঝলে! আমার কী—গঙ্গায় ডুব দিলেই সব শুদ্ধ, কিন্তু ওকে আমি দেখে নেবো।' চাপা গলায় মা বললেন, 'কী যে লাগিয়েছো সেই থেকে—তোমার আর বুদ্ধি হবে না। আগে মেয়ের একটা হিল্লে করো, একটা মোছলমান ছোঁড়া বাড়িতে আসতো-যেতো এ জানলে কি কেউ ওকে ঘরে নেবে?' তখনই বলেছিলাম যে ন' খুড়ির বৌঠানের ভায়ের সঙ্গেই বিয়েটা দাও—'

বাবা খেঁকিয়ে উঠলেন, 'তুমি বলেছিলে, না আমি বলেছিলাম? তুমিই তো নাচতে-নাচতে বললে যে ও আবার একটা সম্বন্ধ!'

আমি নিঃশব্দে বাবার পায়ের জুতোর ফিতে খুলে দিয়ে চা আনতে চ'লে গেলাম।

অনেক রাত পর্যন্ত মা-বাবা সেদিন অনেক কথা কাটাকাটি করলেন। নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে সব শুনলুম। মনের মধ্যে এমন একটা ব্যাকুলতা বোধ করছিলাম যে বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরময়

পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগলাম। একবার মনে হ'লো এর চেয়ে মৃত্যু ভালো—কিন্তু মন সায় দিল না—কেন মরবো? আমার মৃত্যুই যদি মা-বাবাকে সহ্য করতে হয় তাহ'লে এটাই বা তার চেয়ে খারাপ কী? কী অপরাধ সত্যেনের—কেন বঞ্চিত করবো ওকে? বিয়ে না-করাই হবে আমার চরম অন্যায়—নৈতিক অপরাধে অপরাধী হবো আমি।

আকাশ-পাতাল মাথামুণ্ডু ভাবতে ভবতে আমার মাথা যেন পাগলের মতো হয়ে গেলো। আস্তে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম—রাত বেড়েছে—থমথম করছে সমস্ত পৃথিবী। তারা-ভরা অমাবস্যার কালো রাত। তাকিয়ে রইলাম আকাশের দিকে। মা-র ঘরের দরজার কাছে এসে মা-র নিশ্বাসপতনের শব্দটা কান পেতে গ্রহণ করলাম, বদ্ধ দরজার উপরে মাথা রেখে যেন মা-কে অনুভব করবার চেষ্টা করলাম নিজের মধ্যে। কত ছোটো ছোটো কথায় মন ভ'রে উঠলো—চোখ জলে ভ'রে গেলো।

সহসা আমার সমস্ত সত্তা দীর্ণ ক'রে মোটরের হর্নটি বেজে উঠলো। সঙ্গে-সঙ্গেই আমার পায়ের সঙ্গে যেন কে একটি ভারি পাথর বেঁধে দিলো! একটা বৈদ্যুতিক শক খাওয়ার মতো থমকে গেলো আমার শরীরের সমস্ত তন্দ্রা। মাত্রই এক সেকেণ্ড, তারপরে আবাল্যপরিচিত ঘর, চির-অভ্যস্ত জীবন—মা-বাবার অপর্যাপ্ত ভালোবাসার বন্ধন সমস্ত কিছুকে পিছনে ফেলে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়।

চলন্ত গাড়ির মধ্যে আমি যেন একটি মৃত মানুষ। অন্ধকারের মধ্যে এক সময়ে সত্যেন আমাকে স্পর্শ ক'রে বললে, 'ভয় করছে?'

ভাঙা গলায় বললাম. 'না।'

একটু সময় কাটলো। আবার বললো, 'মন কেমন করছে?'

'করাটা কি অন্যায়?' এ-রকম জবাবে একটু দুঃখিত হ'লো বোধ হয়—তারপর সমস্ত রাস্তাই আমাদের নিঃশব্দে কাটলো।

নিতান্ত নিভৃত জায়গায় একটি বাড়ির কাছে এসে গাড়ি থামতেই বাড়ির আলো জ্ব'লে উঠলো, একজন স্ত্রীলোক এসে দরজা খুলে দিলো।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এলাম—স্ত্রীলোকটি আগে-আগে এসে আলো জ্বালিয়ে দিলো। যে-ঘরটি আমার জন্য নির্দিষ্ট ছিলো, সে-ঘরে এসেই সে চ'লে গেলো। সত্যেন বলল, 'এবার তুমি বিশ্রাম করো।'

ঘরটি বেশ প্রশস্ত—মাঝখানে একটি সরু লোহার খাটে ধবধবে বিছানা—শিয়রের কাছে ছোটো টিপায়ের উপর এক গেলাশ জল প্লেট দিয়ে ঢাকা। কোণে দেখলুম একটা আলনায় দু'খানা ধোলাই করা নতুন শাড়ি। চারদিকে তাকিয়ে অত্যন্ত ক্লান্তভাবে ব'সে প'ড়ে বললুম, 'তুমি?'

'পাশের ঘরেই থাকলাম, কিছু ভয় নেই।'

'পাশের ঘরে তো কোনো বিছানা দেখলাম না—'

'সে হবে'খন—তুমি আর রাত কোরো না, শুয়ে পড়ো।' সত্যেন গায়ের পাঞ্জাবিটা খুলে আলনায় রেখে এলো গেঞ্জি-পরা ওর নিটোল শরীর আর প্রশস্ত বুকের দিকে তাকিয়ে আমি রোমাঞ্চিত হলাম।

একেবারেই পাশাপাশি ঘর, দরজা খোলা রাখলে সবই দেখা যায়—ও-ঘরে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিতে-দিতে ও বললো, 'ইচ্ছে করলে ভিতর থেকেও দরজাটা বন্ধ ক'রে দিতে পারো।'

মুহূর্তে বাড়িটি স্তব্ধ হ'য়ে গেলো—খাটের রেলিং-এ হেলান দিয়ে আমি ব'সে রইলাম। নিঃসঙ্গতা আমাকে তিলে-তিলে গ্রাস করতে লাগলো। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না—হঠাৎ ঘুমটা পাতলা হ'য়ে এলো—তন্দ্রার মধ্যেই অনুভব করলাম কে যেন আমার মাথার তলায় বালিশ গুঁজে দিচ্ছে। আমি আরাম পেলাম—খুট ক'রে আলোটিও নিবলো—আলো নেবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার ঘুম ছুটে গেলো, সেই নীরন্ধ্র অন্ধকারে আমি রুদ্ধশ্বাসে মড়ার মতো প'ড়ে রইলাম—কেবল বুকের মধ্যে কেমন একটা ভয় আর প্রতীক্ষা শিরশির ক'রে ক'রে ওঠা-নামা করতে লাগলো। একটু পরেই বুঝলাম সত্যেন চ'লে গেলো নিজের ঘরে। আমার মন বিশ্বাসে আর কৃতজ্ঞতায় ছলছল ক'রে উঠলো।

পরের দিন সকালবেলা ঘুম ভেঙে চুপ ক'রে শুয়ে ছিলাম, দরজায় টোকা দিয়ে সত্যেন বললো, 'ঘুমুচ্ছ?'

'না, এসো।'

দরজা ঠেলে ঘরে এলো—ঐটুকু সময়ের মধ্যেই পরিষ্কার ক'রে দাড়ি কামিয়েছে—স্নান করেছে,—ওর পরিচ্ছন্ন স্নাত চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলাম—নাম-না-জানা কোন সাবান আর ব্রিলেনটিনের মধুর গন্ধে ঘর ভ'রে উঠলো। আমার মাথার কাছে এসে খাটের রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে বললো, 'এবার চা দিক, না?'

'সকালে তো আমি চা খাই না।'

'তাহ'লে দুধ দিক—দাঁড়াও বলি—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম—'কিছু দরকার নেই—আমি এখন খাবো না।'

'তা কী হয়?'—সত্যেন শুনলো না, জানালার কাছে গিয়ে মুখ বার ক'রে বললো, 'মতির মা, ছোটো পটে আমার জন্যে চা এনো—আর ছোটো জগে দুধ এনো।' ফিরে এসে বললো, 'তুমি মুখটুক ধুয়ে নাও, পাশেই বাথরুম আছে।' অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি উঠলাম। সত্যেন বলল, 'এত অল্প সময়ে আমাকে এত সব করতে হয়েছে যে তোমার জন্য কিছুই ব্যবস্থা ক'রে রাখতে পারিনি—শাড়ি এনেছি অথচ তোয়ালে ভুলে গিয়েছি—আমারটাই ব্যবহার করো আজ—কী আর করবে।' বলতে-বলতে ও-ঘর থেকে একখানা তোয়ালে নিয়ে এলো—আলনা থেকে একখানা শাড়ি তুলে আমার হাতে দিয়ে অত্যন্ত বিহ্বল গলায় বলল, 'আমি জানতাম না কাউকে দিলে এত আনন্দ হয়, এত আনন্দ আমি সইবো কেমন ক'রে?'

আমি মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলাম, কথা বললাম না।

ফিরে এসে খাবার আয়োজন দেখে আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। দুধ, ফল, সন্দেশ, লুচি, হালুয়া—প্লেটে-প্লেটে ট্রেটি একেবারে ভর্তি! আমি বললাম, 'এ কী!'

'খাবে না?'

'মানুষে এত খেতে পারে! তাছাড়া সত্যি বলছি আমার একেবারেই খিদে নেই।'

'মিতু, তুমি মন-খারাপ ক'রে আছো?'

আমাকে ও নাম নিয়ে সম্বোধন করলো এই প্রথম। ওর মুখের সম্বোধনে আমি শিহরিত হলাম। বললাম, 'না, মন-খারাপ করবো কেন? খুব ভালো লাগছে।'

'তাহ'লে খেতে চাইছো না কেন ?'

'মন খারাপ হ'লেই বুঝি মানুষে খায় না ?'

'তা ছাড়া আর কী।' সত্যেন হাত গুটিয়ে বসলো। আমি বললাম, 'তাই ব'লে তুমিও খাবে না নাকি ?'

'আমারও খিদে নেই।' আমি এবার হাসলাম। পট থেকে চা ঢেলে দিয়ে বললাম, 'নাও, খাও, কী ছেলেমানুষি করো যে—'

খেতে-খেতে বললাম, 'কাল শুলে কেমন ক'রে ?'

'একটা ডেক চেয়ার ছিলো।'

'সারারাত ডেক চেয়ারে ? ছি ছি !'

'কিছু কষ্ট হয়নি আমার।'

'তা বইকি—আজ অবশ্য বিছানার ব্যবস্থা কোরো।'

'যতক্ষণ না রেজেস্ট্রি হচ্ছে কিছুতেই আর মন দিতে পারছি না আমি। আচ্ছা, তোমার বয়স কত ?'

উনিশ বছর ছ' মাস।'

'তাহ'লে আর ভয় কী। আমি ওদের আজকেই যাতে হয় তার ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম, কোর্টে গেলে তাড়াতাড়ি হ'য়ে যেতো কিন্তু আমার ইচ্ছে করে না তোমাকে নিয়ে কোর্টে যেতে। তাছাড়া রেজিস্ট্রার আমাদের অনেক কালের চেনা, তিনি নিজে থেকেই বললেন বাড়িতে আসবেন।'

আমি হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলাম মুখের দিকে—এতখানি কাণ্ড করলাম—ভালোবেসে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, অথচ আমাদের বিবাহ হবে কেমন ক'রে সেটাই আমি এতক্ষণ মনে করিনি—হিন্দু-মুসলমানের বিবাহ যে শালগ্রাম শিলা সাক্ষী ক'রে পুরুত ডেকে হবে না, এটা আমার মাথায়ই আসেনি— রেজেস্ট্রি করার কথা শুনে

এতক্ষণে সে-বিষয়ে সচেতন হ'য়ে বললাম, 'ও-সব চুকে গেলেই রক্ষে পাই—আমার বড়ো ভয় করছে বাবার কথা ভেবে।' অত্যন্ত নিরুদ্বেগে সত্যেন বললো, 'উনি যদি বা তোমাকে খুঁজে বার করেন, মুসলমান ব'লে তক্ষুনি বর্জন করবেন। শোনো, আমাকে একটা লিস্ট ক'রে দাও তো কী-কী তোমার লাগবে—আমি একটু বেরুই।'

'ও-সব হ'য়ে গেলেই বেরিয়ো, এখন থাক।'

'কিন্তু চলবে কেমন ক'রে, তা'ছাড়া ঝি-টিই বা কী মনে করছে কে জানে।'

'ও কে?'

'আমার এক বন্ধুর বাড়ির পুরোনো লোক—ওরা ওর কাছে তোমার সম্বন্ধে কী বলেছে তা তো বুঝতেই পারছো, এ-রকম জিনিশপত্রহীন বৌ দেখলে ওর যে সন্দেহ হবে।'

'হোক, তোমার না-বেরুনোই ভালো।'

আড়ামোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'ওদেরো তো আটটার সময় আসবার কথা—আচ্ছা, তুমি লিখে দাও তো—না-হয় বন্ধুদের দিয়েই আনিয়ে নেবো।'

'বন্ধু বন্ধু বলছো যে, আর কেউ কি জানে নাকি?'

'বা, জানে না?' সত্যেন হাসলো—'ওরাই তো আমার সব ঠিক ক'রে দিলে। উইটনেসও তো ওরাই হবে।'

'উইটনেস? উইটনেস কিসের?'

'বাঃ, আমাদের যে বিয়ে হবে তার সাক্ষী।'

জানতাম না এ-সব সাক্ষীর ব্যাপার, তাই চুপ ক'রে গেলাম। একটু পরেই স্ত্রীলোকটি চায়ের বাসন নিতে এলো। ওকে দেখে

একটু সংকুচিত হ'য়ে বললো, 'বাজারে যাবো এখন ?' আমার হ'য়ে ও-ই বললো, 'হ্যাঁ, যাবে বইকি—ব'লে দাও কী-কী আনবে।'

বিপদে পড়লাম—মনে করবার চেষ্টা করলাম মা বাবাকে কী-কী আনতে বলতেন—আমার অবস্থা দেখে ও নিজেই বললো, 'তোমার ইচ্ছামতো যা খুশি এনে রান্না করো গে, ওঁর শরীরটা ভালো না কিনা।' ঝি কেমন একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে চ'লে গেলো। 'এ-রকম কর্ত্রী হ'লেই হয়েছে,'—ব'লে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে এসে খাটের উপর টান হ'তে-হ'তে বললো, 'রাগ না করো তো তোমার বিছানায় একটু শুই।'

শুতে-না-শুতে ওর বন্ধুরা রেজিস্ট্রারকে নিয়ে এসে হাজির হ'লো।

বিবাহের নমুনা দেখে আমি অবাক হলাম। এই নাকি বিয়ে ? সময় বোধ হয় চল্লিশ মিনিটও লাগলো না, হাঁড়ি-হাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে এলো ওরা—খুব হৈ-হল্লা ক'রে খাওয়া হ'লো—রেজিস্ট্রার আগেই চলে গেলেন, আর ঐ ভদ্রলোক তিনজন একেবারে আমাদের সঙ্গে খেয়ে গেলেন। খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে বন্ধুদের বিদায় দিয়ে আমরা আবার যখন নিভৃত হলাম, তখন বোধ হয় বেলা দুটো। ঘরের ছিটকিনিটা তুলে দিয়ে বললো, 'এইবার আমরা আইনত স্বামী-স্ত্রী হলাম।'

আমি মুখ নিচু ক'রে ছিলাম, হঠাৎ ও আমার একান্ত কাছে এসে দাঁড়ালো, তারপর নিচু হ'য়ে আমার মুখে বিবাহের প্রথম প্রণয়চিহ্ন এঁকে দিলো। দুপুরটা কাটলো একটা অস্বাভাবিক বিহ্বলতার মধ্যে। সুখের ভারে সমস্ত শরীর আমার অবশ হ'য়ে রইলো। রাত্রে নামমাত্র খেয়ে যখন আবার আমাদের শোবার

সময় হ'লো, তখন আমার দিকে চেয়ে ও জিজ্ঞাসা করলো, 'কোথায় শোবো ?'

'কোথায় তোমার ইচ্ছে ?'

'ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা ওঠে নাকি—' আমাকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে বললো, 'আজ আমাদের বিয়ের প্রথম রাত্রি না ? বিছানা যতই ছোট হোক—'

'অসভ্য।'

'এর নাম বুঝি অসভ্যতা ?'—উঠে গিয়ে খুট ক'রে আলো নিবিয়ে দিয়ে এলো।

জেগে ঘুমিয়ে কেমন ক'রে আমার সে-রাত কেটেছিলো, তা কেমন ক'রে বোঝাবো। সে-রকম রাত্রি কি আর কোনো মেয়ের জীবনে এসেছে ? খুব সকালে আমার ঘুম ভাঙলো। ওর বলিষ্ঠ আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে উঠে বসলাম—তাকিয়ে রইলাম নির্নিমেষে ওর ঘুমন্ত আর সুখী মুখখানার দিকে। দেখতে-দেখতে সমস্ত হৃদয় যেন ভ'রে গেলো। মনে-মনে বললুম, 'ঈশ্বর, আর কিছুই চাই না—এ-মুখ যেন জীবন ভ'রে দেখতে পাই।' সন্তর্পণে নিজের মুখটা কিছুক্ষণের জন্য রাখলাম ওর কপালের উপর, তারপর একটা নিশ্বাস নিয়ে জানালায় এসে দাঁড়ালাম। মনে হ'লো কেউ কথা বলছে একতলায়। এত সকালে কে এলো ? কান পাতলাম—ঝিয়ের গলা পেলাম, 'হ্যাঁ বাবু, আমারো কেমন সন্দেহ হয়।'

'ঠিকই ধরেছেন, ইন্সপেকটরবাবু—' সঙ্গে সঙ্গে ভারি জুতোর আওয়াজে সিঁড়ি ভ'রে গেলো। জানালা ছেড়ে আমি ওকে ধাক্কা দিয়ে বললাম, 'ওঠো, ওঠো—আমার ভয়ানক ভয় করছে।' হাসিমুখে ও চোখ খুললো। আমার শঙ্কিত মুখের দিকে তাকিয়ে

বললো, 'কী হ'লো?' সঙ্গে সঙ্গে দরজায় লাঠির আঘাত শুনে চমকে উঠে বললো, 'কে?' আমি জড়িয়ে ধ'রে বললাম, 'খুলো না, ওরা পুলিশ।'

'পুলিশ আমার কী করবে? আইনত তুমি আমার স্ত্রী—বাড়ি চড়াও করবার জন্য আমি ওদের জেল খাটাবো।' আমার কথা শুনলো না, দরজা খুলে দিলে। হুড়মুড় ক'রে প্রথমেই যিনি ঘরে ঢুকলেন তিনি আমার বাবা, পিছনে ইউনিফর্ম-পরা ইন্সপেকটর—তার পিছনে দু'জন পুলিশ। আমাকে দেখতে পেয়েই বাবা বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন, 'এই যে হারামজাদি—' চুলের মুঠি ধ'রে আমাকে তিনি মাটি থেকে শূন্যে তুললেন। লাফিয়ে এলো সত্যেন,—'কক্ষনো হাত দেবেন না আমার স্ত্রীর গায়ে—'

'হারামজাদা, লম্পট'—ঠাশ করে সত্যেনের গালের উপর এক চড় কষিয়ে দিয়ে বাবা বললেন, 'তোমার বদমাইসি বার করছি এবার—হাতকড়া লাগান, রজনীবাবু।'

আমি রুখে দাঁড়ালাম, 'কক্ষনো না, আইন অনুসারে আমরা বিবাহিত—আমি সাবালিকা—আমার উপর তোমার কোন হাত নেই—স্বেচ্ছায় আমি বিয়ে করেছি একে।'

'বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে—' সত্যেনের গলা চিরে শব্দ বেরুলো। ইন্সপেকটর রসিকতা ছাড়লেন, 'তাই নাকি, চাঁদ! আচ্ছা—তেওয়ারি, হাতকড়া লাগাও।'

আমি বাবার পা জড়িয়ে ধরলাম, 'রক্ষা করো, বাবা, রক্ষা করো।' বাবা গায়ের জোরে আমার আঁচলের কাপড় আমার মুখে গুঁজে দিলেন, তারপর টানতে টানতে ঝি-টার চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে তুললেন ট্যাক্সিতে।

পিছনে সত্যেন ভাঙা গলায় চীৎকার ক'রে উঠল, 'এ-অন্যায়ের প্রতিশোধ আমি নেবো, নেবো, নেবো—'

বাড়িতে এনেই বাবা আমাকে শক্ত ক'রে হাতে পায়ে বেঁধে ঘরের দরজা বন্ধ করলেন। হাতে চাবুক লিক্‌লিক্‌ ক'রে নাচতে লাগলো। 'বল, বল, হারামজাদি, কেন আমার জাত মান সব খোয়ালি তুই।'

হুশ হুশ শব্দে সমানে চাবুক পড়তে লাগলো আমার সমস্ত গায়ে। নিঃশব্দে শরীরকে সইতে দিলাম। আমার নীরবতা বাবার ক্রোধকে আরো উদ্দীপ্ত করলো। 'তবু হারামজাদি কথা বলবি না ? তবু বলবি না অন্যায় করেছিস ? তবু বলবি না ? বল্, বল্—। প্রত্যেকটা কথার সঙ্গে-সঙ্গে আমি বাবার হাতের ওঠা-পড়া দেখতে দেখতে বললাম, 'মারো, আরো মারো—মেরে ফেল, তবু বলবো না অন্যায় করেছি, খুন ক'রে ফেল, তবু বলবো না—'

মা দরজা ধাক্কাতে-ধাক্কাতে বলতে লাগলেন, 'ওগো তুমি করছো কী, ওকে কি মেরে ফেলবে ? খোলো, খোলো শিগগির।' বাবা ক্লান্ত হয়েছিলেন—চাবুক রেখে ঘাম মুছতে মুছতে দরজা খুলে দিলেন। মা ঘরে ঢুকে আমার দিকে তাকিয়ে কেঁদে উঠলেন। 'এই করেছো তুমি!' আমার রক্তাক্ত স্ফীত মাংসখণ্ডগুলো তিনি আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'পশু।' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বাবা তাকালেন মা-র দিকে তারপর বজ্রকণ্ঠে বললেন, 'বেরিয়ে যাও ঘর থেকে—' ব'লে নিজেই তাঁকে বের ক'রে দিলেন, তারপর নিজেও বেরিয়ে গিয়ে বললেন, 'চিরজীবন, চিরজীবন তুই বন্দী হ'য়ে থাক্ এই ঘরে।' বাইরের দরজায় শিকল তোলার শব্দ হ'লো।

শুনতে পেলুম কান্নাভরা গলায় মা বলছেন, 'এই যদি করবে

ওকে—যদি ওকে মেরেই ফেলবে তবে আনলে কেন তুমি—কেন ওকে থাকতে দিলে না ওর জীবন নিয়ে—'

'কী, কী বললে তুমি? ওকে থাকতে দেবো ওর জীবন নিয়ে —তারপর! তারপর যদি ওর সন্তান হয়? আমি হবো সেই মোছলমানের বাচ্চার মাতামহ?'

হা ঈশ্বর! অত দুঃখেও বাবার কথা শুনে আমার হাসি পেলো।

আজ তিনদিন আমি বন্দী হ'য়ে আছি এই ঘরে—এখনো বাবার রাগ পড়েনি—মা কী করবেন, তিনিও তো মেয়ে—তাই তিনি আমারই মতো অসহায়—জানালা দিয়ে করুণ চোখে তাকিয়ে থাকেন আমার দিকে। দিনে একবার আমাকে খোলা হয়—কয়েদির মতো সঙ্গে ক'রে মা আমাকে স্নানে নিয়ে যান, তাও বাবা আপিশে যাবার আগে—চেয়ে চিন্তে একটি খাতা আর একটি কলম জোগাড় করেছি—তাই দিয়ে লিখে রাখলাম আমার হতভাগ্য জীবনের কাহিনী। কাল ওর শেষ চিহ্ন আংটিটিও বাবা ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন আমার হাত থেকে।—আমার কি মৃত্যু নেই?

* * * *

এই পর্যন্ত লেখা হ'য়েই তারপর নানারকম অসংলগ্ন কথায় কাগজগুলো ভর্তি—বুঝলাম মাথা-খারাপের ঐ হ'লো সূত্রপাত। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সমস্ত কাগজগুলো জড়িয়ে পকেটে রাখলাম—বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম—অন্ধকার কেটে কখন আলো ফুটেছে। মনে-মনে ভাবলাম সেই ইউসুফ এখন কোথায়? কে সে? পৃথিবীর এই জনারণ্যে কোনোদিন কি আমি তাকে খুঁজে বার ক'রে এ লেখাটি তার হাতে দিতে পারবো?

সমাপ্ত

